শজারুর কাঁটা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

০১. ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল মাস তিনেক আগে 2
০২. একটি ছোট দোতলা বাড়ি 10
০৩. পরদিন দেবাশিস একটু দেরি করে এল 39
০৪. দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল....................64
০৫. চা খেতে খেতে দেবাশিস বলল 84
০৬. অতিথিরা একে একে এসে উপস্থিত....................109
০৭. বিয়ের পর দু'মাস কেটে গেল 138
০৮. ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু....................148
০৯. বিজয় নিজেদের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল 170
১০.মেঘাচ্ছন্ন সকালবেলা....................186

০১. ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল মাস তিনেক আগে

উপক্রম

ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল মাস তিনেক আগে এবং কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলেই আবদ্ধ হয়ে ছিল।

গোল পার্কের আড়-পার একটা রাস্তার কোণের ওপর একটি অস্থায়ী চায়ের দোকান। দিনের আলো ফোটবার আগেই সেখানে চা তৈরি হয়ে যায়। মাটির ভাঁড়ে গরম চা। সঙ্গে বিস্কুটও পাওয়া যায়। এই দোকানের অধিকাংশ খদের ট্যাকসি ড্রাইভার, বাস কন্ডাক্টর ইত্যাদি। যাদের খুব সকালে কাজে বেরুতে হয় তারা এই দোকানের পৃষ্ঠপোষক।

বুড়ো ভিখিরি ফাগুরাম ছিল এই দোকানের খদের। সে রাত্রে ফুটপাথের একটা ঘোঁজের মধ্যে শুয়ে থাকত, ভোর হতে না হতে দোকান থেকে এক ভাঁড় চা আর দু'টি বিস্কুট কিনে তার ভিক্ষাস্থানে গিয়ে বসত। ফাগুরামের বয়স অনেক, উপরন্তু সে বিকলাঙ্গ, তাই দিনান্তে সে এক টাকার বেশি রোজগার করত।

সেদিন ফাল্গুন মাসের প্রত্যুষে আকাশ থকে তখনো কুয়াশার ঘোর কাটেনি, ফাগুরাম দোকান থেকে চায়ের ভাঁড় আর বিস্কুট নিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল। চায়ের দোকানে লোক থাকলেও রাস্তায় তখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি।

ফাগুরামের অভ্যাস, সে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে খায়। সে এক চুমুক চা খেয়ে বিস্কুটে একটি ছোট্ট কামড় দিয়েছে, তার মনে হল পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সে পিছন দিকে ঘাড় ফেরালো, কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছু দেখবার আগেই সে পিঠের দিকে কাঁটা ফোটার মত তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল। অর্ধভুক্ত বিস্কুট তার হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

ভিক্ষুক ফাগুরামের অপমৃত্যুতে বিশেষ হইচই হল না। দিনের আলো ফুটলে তার মৃতদেহটা পথচারীদের চোখে পড়ল, তারা মৃতদেহকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর লাশ স্থানান্তরিত হল। খবরের কাগজের এক কোণে খবরটা বেরুল বটে, কিন্তু সেটা মারণাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যে। ভিক্ষুকের পিঠের দিক থেকে একটা ছয় ইঞ্চি লম্বা শজারুর কাঁটা তার হৃদযন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রে যারা খবরটা পড়ল। তারা এই নিয়ে একটু আলোচনা করল। ভিক্ষুককে কে খুন করতে পারে? হয়তো অন্য কোনো ভিক্ষুক খুন করেছে। কিন্তু শজারুর কাটা কেন? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর নেই। পুলিস এ ব্যাপার নিয়ে বেশি দিন মাথা ঘামাল না।

মোসখানেক পরে কিন্তু ভিক্ষুকের অপমৃত্যুর কথাটা আবার সকলের মনে পড়ে গেল। আবার শজারুর কাঁটা। রাত্রে রবীন্দ্র সরোবরের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে একজন মুট-মজুর শ্রেণীর লোক ঘুমোচ্ছিল, আততায়ী কখন এসে নিঃশব্দে তার বুকের বাঁ দিকে শজারুর কাঁটা বিঁধে দিয়ে চলে গেছে। সকালবেলা যখন লাশ আবিষ্কৃত হল তখন মৃতদেহ শক্ত হয়ে গেছে। মৃতের পরিচয় তখনো জানা যায়নি।

এবার সংবাদপত্রের সামনের দিকেই খবরটা বেরুল এবং বেশ একটু সাড়া জাগিয়ে তুলল। ছোরাজুরির বদলে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করার মানে কি! খুনী কি পাগল? ক্রমে মৃত ব্যক্তির পরিচয় বেরুল, তার নাম মঙ্গলরাম; সে সামান্য একজন মজুর, তার থাকবার জায়গা ছিল না, তাই যখন যেখানে সুবিধা হত। সেখানে রাত কাটাত। তার শত্রু কেউ ছিল না, অন্তত খুন করতে পারে এমন শত্রু ছিল না। পুলিস দু-চার দিন তল্লাশ করে হাল ছেড়ে দিল।

তৃতীয় দিনের ঘটনাটা হল আরো দু' হস্তী পরে। গরম পড়ে গেছে, দিন বাড়ছে, রাত কমছে।

গুণময় দাসের জীবনে সুখ ছিল না। তাঁর একটি ছোট মনিহারীর দোকান আছে, একটি ছোট পৈতৃক বাস্তুভিটা আছে আর আছে একটি প্রচণ্ড দাজ্জাল বউ। তার চল্লিশ বছর বয়সেও ছেলে।পুলে হয়নি, হবার আশাও নেই। তাই রসের অভাবে তাঁর জীবনটা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছিল। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে মদ ধরেছিলেন। জীবন যখন শুকায়ে যায় তখন ওই বস্তুটি নাকি করুণাধারায় নেমে আসে।

রাত্রি আটটার সময় গুণময়বাবু দোকান বন্ধ করে বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে তাঁর প্রাণে কোনো উৎসাহ ছিল না, বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে আজ তিনি স্ত্রীর কোন প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখবেন এই চিন্তায় তাঁর পদক্ষেপ মন্থর হয়ে আসছিল।

তারপর সামনেই যখন মদের দোকানের দরজা খোলা পাওয়া গেল তখন স্যুট করে সেখানে ঢুকে পড়লেন।

এক ঘণ্টা পরে দোকান থেকে বেরিয়ে তিনি আবার গড়িয়ার দিকে চললেন; ওই দিকেই তাঁর বাড়ি। যেতে যেতে তাঁর পা একটু টলতে লাগল, তিনি বুঝলেন আজ মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে। স্ত্রী যদি বুঝতে পারে, যদি মুখে গন্ধ পায়–

আরো কিছু দূর যাবার পর রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং আরম্ভ হল রাস্তার ডান পাশে। পথে লোকজন বেশি নেই, লেকের অন্ধকার এবং রাস্তায় আলো মিলে একটা অস্পষ্ট কুজাঝটিকার সৃষ্টি করেছে।

গুণময়বাবু রাস্তার একটা নিরিবিলি অংশে এসে লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, রেলিং-এ হাত রেখে প্যাঁচার মত চক্ষু মেলে ভিতরের দিকে চেয়ে রইলেন।

একটি লোক গুণময়বাবুর কুড়ি-পঁচিশ হাত পিছনে আসছিল; সে গুণময়বাবুর পদসঞ্চারের টলমল ভাব লক্ষ্য করেছিল। তাই তিনি যখন রেলিং ধরে দাঁড়ালেন তখন সেও বিশ-পাঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করে অলস পদে তাঁর দিকে অগ্রসর হল।

লোকটি যখন গুণময়বাবুর পিছনে এসে দাঁড়াল তখনো তিনি কিছু জানতে পারলেন না। লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে দেখল লোক নেই। সে পকেট থেকে শলাকার মত একটি

অস্ত্র বার করল, অস্ত্রটিকে আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরে গুণময়বাবুর পিঠের বা দিকে পাঁজরার হাড়ের ফাঁক দিয়ে গভীরভাবে বিঁধিয়ে দিল। গুণময়বাবুর গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি ছিল, শলাকা সটান তাঁর হৃদযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

গুণময়বাবু পলকের জন্যে বুকে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করলেন, তারপর তাঁর সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয়ে গেল।

অতঃপর খবরের কাগজে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হল। একটা বেহেড পাগল শজারুর কাঁটা নিয়ে শহরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু অকর্মণ্য পুলিস তাকে ধরতে পারছে না, এই আক্ষেপের উষ্মা কলকাতার অধিবাসীদের, বিশেষত দক্ষিণ দিকের অধিবাসীদের গরম করে তুলল। বৈঠকে বৈঠকে উত্তেজিত জল্পনা চলতে লাগল। সন্ধ্যার পর পার্কের জনসমাগম প্রায় শূন্যের কোঠাতে গিয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে দিন দশ-বারো কাটল। বলা বাহুল্য, আততায়ী ধরা পড়েনি, কিন্তু উত্তেজনার আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছে। একদিন ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে রাত্রি সাড়ে ন'টার পর ইন্সপেক্টর রাখালবাবু এসেছিলেন, অজিতও উপস্থিত ছিল; স্বভাবতাই শজারুর কাঁটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

অজিত বলল,–'কিন্তু এত অস্ত্রশস্ত্র থাকতে শজারুর কাটা কেন?'

রাখালবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকালেন; ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলল–'সম্ভবত আততায়ীর পোষা শজারু আছে। বিনামূল্যে কাঁটা পায় তাই ছোরাছুরির দরকার হয় না।'

অজিত বলল—'বাজে কথা বলে না। নিশ্চয় কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আচ্ছা রাখালবাবু, এই যে তিন-তিনটে খুন হয়ে গেল, আসামী তিনজন কি একজন সেটা বুঝতে পেরেছেন?'

রাখালবাবু বললেন—'একজন বলেই তো মনে হয়।'

ব্যোমকেশ বলল–'তিনজন হতেও বাধা নেই। মনে কর, প্রথমে একজন হত্যাকারী ভিখিরিকে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করল। তাই দেখে আর একজন হত্যাকারীর মাথায় আইডিয়া খেলে গেল, সে একজন ঘুমন্ত মজুরকে কাঁটা দিয়ে খুন করল। তারপর–

'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। তিন নম্বর হত্যাকারী তাই দেখে একজন দোকানদারকে খুন করল।'

ব্যোমকেশ বলল–'সম্ভব। কিন্তু যা সম্ভব তাই ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। তার চেয়ে ঢের বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা হচ্ছে, যারা খুন হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ভিখিরি, একজন মজুর এবং একজন দোকানদার।'

'এর মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ কী আছে, আমার বুদ্ধির অগম্য। তোমরা গল্প কর, আমি শুতে চললাম।' অজিত উঠে গেল। তার আর রহস্য-রোমাঞ্চের দিকে ঝোঁক নেই।

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে চেয়ে মৃদু হাসলেন, তারপর গভীর হয়ে বললেন—'সত্যিই কি পাগলের কাজ? নইলে তিনজন বিভিন্ন স্তরের লোককে খুন করবে। কেন? কিন্তু পাগল হলে কি সহজে ধরা যেত না?'

ব্যোমকেশ বলল–'পাগল হলেই ন্যালাক্ষ্যাপা হয় না। অনেক পাগল আছে যারা এমন ধূর্ত যে তাদের পাগল বলে চেনাই যায় না।'

রাখালবাবু বললেন—'তা সত্যি। ব্যোমকেশদা, আপনি যতাই থিওরি তৈরি করুন, আপনার অন্তরের বিশ্বাস একটা লোকই তিনটে খুন করেছে। আমারও তাই বিশ্বাস। এখন বলুন দেখি, যে লোকটা খুন করেছে সে পাগল—এই কি আপনার অন্তরের বিশ্বাস?'

ব্যোমকেশ দ্বিধাভরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কি একটা বলবার জন্যে মুখ তুলেছে এমন সময় দ্রুতচ্ছন্দে টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ টেলিফোন তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ শুনল, তারপর রাখালবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল–'তোমার কলা।'

ফোন হাতে নিয়ে রাখালবাবু বললেন-'হ্যালো–' তারপর অপর পক্ষের কথা শুনতে শুনতে তাঁর মুখের ভাব বদলে যেতে লাগল। শেষে-আচ্ছা, আমি আসছি বলে তিনি আস্তে আস্তে

ফোন রেখে দিলেন, বললেন–'আবার শজারুর কাঁটা। এই নিয়ে চার বার হল। এবার উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোক। কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোক মারা যাননি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ব্যোমকেশ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল–'মারা যাননি?' রাখালবাবু বললেন—'না। কি যেন একটা রহস্য আছে। আমি চলি। আসবেন নাকি?' ব্যোমকেশ বলল—'অবশ্য।'

০২. একটি ছোট দোতলা বাড়ি

কাহিনী

দক্ষিণ কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন রাস্তার ওপর একটি ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। খোলা জায়গায় এখানে ওখানে কয়েকটা অনাদৃত ফুলের গাছ।

বাড়িটি কিন্তু অনাদৃত নয়। বাড়ির বহিরঙ্গ যেমন ফিকে নীল রঙে রঞ্জিত এবং সুশ্রী, ভিতরটিও তেমনি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম। নীচের তলায় একটি বসবার ঘর; তার সঙ্গে খাবার ঘর, রান্নাঘর এবং চাকরের ঘর। দোতলায় তেমনি একটি অন্তরঙ্গ বসবার ঘর এবং দু'টি শয়নকক্ষ। বছর চার-পাঁচ আগে যিনি এই বাড়িটি প্রৌঢ় বয়সে তৈরি করিয়েছিলেন তিনি এখন গতাসু, তাঁর একমাত্র পুত্র দেবাশিস এখন সস্ত্রীক এই বাড়িতে বাস করে।

একদিন চৈত্রের অপরাহ্নে দোতলার বসবার ঘরে দীপা একলা বসে রেডিও শুনছিল। দীপা দেবাশিসের বউ; মাত্র দু'মাস তাদের বিয়ে হয়েছে। দীপা একটি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। ঘরে আসবাব বেশি নেই; একটি নীচু টেবিল ঘিরে কয়েকটি আরাম-কেদারা; দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তপোশ, তার ওপর ফরাশ ও মোটা তাকিয়া। এ ছাড়া ঘরে আছে রেডিওগ্রাম এবং এক কোণে টেলিফোন।

রেডিওগ্রামের ঢাকনির ভিতর থেকে গানের মৃদু গুঞ্জন আসছিল। ঘরটি ছায়াচ্ছন্ন, দোর জানিলা ভেজানো। দীপা চেয়ারের পিঠে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। বাড়িতে একলা তার সারা দুপুর এমনিভাবেই কাটে।

দীপার এই আলস্যশিথিল চেহারাটি দেখতে ভাল লাগে। তার রঙ ফসহি বলা যায়, মুখের গড়ন ভাল; কিন্তু ভ্রূর ঋজু রেখা এবং চিবুকের দৃঢ়তা মুখে একটা অপ্রত্যাশিত বলিষ্ঠতা এনে দিয়েছে, মনে হয়। এ মেয়ে সহজ নয়, সামান্য নয়।

দেয়ালের ঘড়িতে ঠুং ঠুং করে পাঁচটা বাজল। দীপার চোখ দু'টি অমনি খুলে গেল; সে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল, তারপর উঠে বাইরের দরজার দিকে চলল। দরজা খুলতেই সামনে সিঁড়ি নেমে গেছে। দীপা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুকে ডাকল-নকুল।'

নকুল বাড়ির একমাত্র চাকর এবং পাচক, সাবেক কাল থেকে আছে। সে একতলার খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঁচু দিকে চেয়ে বলল—'হ্যাঁ বউদি, দাদাবাবুর জলখাবার তৈরি আছে।'

দীপা তখন গায়ের শিথিল কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁচেছে এমন সময় কিড়িং কিড়িং শব্দে সদর দরজার ঘন্টি বেজে উঠল।

দীপা গিয়ে দোর খুলে দিল। কোট-প্যান্ট পরা দেবাশিস প্রবেশ করল। দু'জনে দু'জনের মুখের পানে তাকাল কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফুটল না। এদের জীবনে হাসি সুলভ নয়। দীপা নিরুৎসুক সুরে বলল—'জলখাবার তৈরি আছে।'

দেবাশিস কণ্ঠস্বরে শিষ্টতার প্রলেপ মাখিয়ে বলল–'বেশ, বেশ, আমি জামাকাপড় বদলে এখনই আসছি।'

সে তরতার করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দীপা মন্থর পদে খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলের এক পাশে বসিল।

লম্বাটে ধরনের খাবার টেবিল; চারজনের মত জায়গা, গাদাগাদি করে ছ'জন বসা চলে। দীপা এক প্রান্তে বসে দেখতে লাগল, নকুল দু'টি প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে; লুচিভাজা, আলুর দম, বাড়িতে তৈরি সন্দেশ। নকুল মানুষটি বেঁটে-খাটো, মাথার চুল পেকেছে, কিন্তু শরীর বেশ নিটোল। বেশি কথা কয় না, কিন্তু চোখ দু'টি সতর্ক এবং জিজ্ঞাসু। দীপা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল-নকুল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। তবু নকুলের সামনে ধোঁকার টাটি সুড় রাখতে হয়। শুধু নকুল কেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সামনে। বিচিত্র তাদের বিবাহিত ধুতি পাঞ্জাবি পরে দেবাশিস নেমে এল। একহারা দীঘল চেহারা, ফস সুশ্রী মুখ; বয়স সাতাশ কি আটাশ। সে টেবিলের অন্য প্রান্তে এসে বসতেই নকুল খাবারের প্লেট এনে তার সামনে রাখল, দীপার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল– 'তোমাকেও দেব নাকি বউদি?

দীপা মাথা নেড়ে বলল–'না, আমি পরে খাব।' দেবাশিসের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া এখনো তার অভ্যাস হয়নি; তার বাপের বাড়িতে অন্য রকম রেওয়াজ, পুরুষদের খাওয়া শেষ হলে তবে মেয়েরা খেতে বসে। দীপা সহজে অভ্যাস ছাড়তে পারে না; তবু রাত্রির আহারটা দু'জনে টেবিলের দু' প্রান্তে বসে সম্পন্ন করে। নইলে নকুলের চোখেও বড় বিসদৃশ দেখাবে।

কিছুক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই; দেবাশিস একমনে লুচি, আলুর দাম খাচ্ছে; দীপা যা-হোক একটা কোনো কথা বলতে চাইছে কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। পিছন থেকে নকুলের সতর্ক চক্ষু তাদের লক্ষ্য করছে।

শেষ পর্যন্ত দেবাশিসই প্রথম কথা কইল, সোজা হয়ে বসে দীপার পানে চেয়ে একটু হেসে বলল–'আজ একটা নতুন ক্রিম তৈরি করেছি।'

দেবাশিসের কাজকর্ম সম্বন্ধে দীপা কখনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি। কিন্তু এখন সে আগ্রহ দেখিয়ে বলল–'তাই নাকি? কিসের ক্রিম?'

দেবাশিস বলল–'মুখে মাখার ক্রিম।'

'ও মা, সত্যি? কেমন গন্ধ?'

'তা আমি কি করে বলব। যারা মাখবে তারা বলতে পারবে।'

‘তা বাড়িতে একটু যদি আনো, আমি মেখে দেখতে পারি।’

দেবাশিস হাসিমুখে মাথা নাড়ল–’তোমার এখন মাখা চলবে না, অন্য লোকের মুখে মাখিয়ে দেখতে হবে মুখে ঘা বেরোয় কিনা। পরীক্ষা না করে বলা যায় না।’

‘কার মুখে মাখিয়ে পরীক্ষা করবে?’

‘ফ্যাক্টরির দারোয়ান ফৌজদার সিং-এর মুখে মাখিয়ে দেখব। তার গালের চামড়া হাতির চামড়ার মত।’

দীপার মুখে হাসি ফুটল; সে যে নকুলের সামনে অভিনয় করছে তা ক্ষণকালের জন্যে বিস্মরণ হয়েছিল, দেবাশিসের মুখের হাসি তার মুখে সংক্রামিত হয়েছিল।

আহার শেষ করে দেবাশিস উঠল। দু’জনে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়াল। দেবাশিস হঠাৎ আগ্রহভরে বলল–’দীপা, আজ উৎপলা সিনেমাতে একটা ভাল ছবি দেখাচ্ছে। দেখতে যাবে?

দেবাশিস আগে কখনো দীপকে সিনেমায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেনি; দীপার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ বয়ে গেল। তারপরই তার মন শক্ত হয়ে উঠল। সে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল-না, আমি যাব না।’

দেবাশিসের মুখ ম্লান হয়ে গেল, তারপর গভীর হয়ে উঠল। সে কিছুক্ষণ দীপার। পানে চেয়ে থেকে বলল–'ভয় নেই, সিনেমা-ঘরের অন্ধকারে আমি তোমার গায়ে হাত দেব না।'

আবার দীপার শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু সে আরো শক্ত হয়ে বলল—'না, সিনেমা আমার ভাল লাগে না।' এই বলে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। দেবাশিস ওপর দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল–'আমি নৃপতিদার বাড়িতে যাচ্ছি, ফিরতে সাড়ে আটটা হবে।'

সদর দরজা খুলে দেবাশিস বাইরে এল, দোরের সামনে তার ফিয়েট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে; কাজ থেকে ফিরে এসে সে গাড়িটা দোরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ভেবেছিল, সিনেমা দেখতে যাবার প্রস্তাব করলে দীপা অমত করবে না। তার মন সহজে তিক্ত হয় না, আজ কিন্তু তার মন তিক্ত হয়ে উঠল। এতটুকু বিশ্বাস দীপা তাকে করতে পারে না! এই দু' মাস দীপ তার বাড়িতে আছে, কোনো দিন কোনো ছুতোয় সে দীপার গায়ে হাত দেয়নি, নিজের দাম্পত্য অধিকার জারি করেনি। তবে আজ দীপা তাকে এমনভাবে অপমান করল কেন?

দেবাশিস গাড়ির চালকের আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। বাড়ির পিছন দিকে গাড়ি রাখার ঘর, সেখানে গাড়ি রেখে সে পায়ে হেঁটে বেরুল। নৃপতি লাহার বাড়ি পাঁচ

মিনিটের রাস্তা। নৃপতির বৈঠকখানায় রোজ সন্ধ্যার পর আড্ডা বসে, দেবাশিস প্রায়ই সেখানে যায়।

দীপা ওপর এসে আবার আরাম-কেন্দারায় এলিয়ে পড়ল। তার মনের মধ্যে দশদিক তোলপাড় করে ঝড় বইছে, সারা গায়ে অসহ্য ছট্‌ফটানি। অভ্যাসবিশেই সে হাত বাড়িয়ে রেডিওগ্রাম চালিয়ে দিল; কোনো একটি মহিলা ইনিয়ে-বিনিয়ে আধুনিক গান গাইছেন। কিছুক্ষণ শোনার পর সে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে চোখ বুজে। চুপ করে রইল। কিন্তু বুকের মধ্যে ঝড়ের আফসানি কমল না। তখন সে উঠে অশান্তভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল, অস্ফুট স্বরে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল–'এভাবে আর কত দিন চলবে?'

দীপা যদি হালকা চরিত্রের মেয়ে হত, তাহলে তার জীবনে বোধ হয় কোনো ঝড়-ঝাপটাই আসত না।

দীপা বনেদী বংশের মেয়ে। একসময় খুব বোলবোলাও ছিল, তালুক-মুলুক ছিল, এখন অনেক কমে গেছে; তবু মরা হাতি লাখ টাকা। বোলবোলাও কমলেও বংশের মর্যাদাবোধ আর গোঁড়ামি তিলমাত্র কমেনি। দীপার ঠাকুরদা উদয়মাধব মুখুজে এখনো বেঁচে আছেন, তিনিই সংসারের কর্তা। এক সময় একটি বিখ্যাত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়ার ফলে অবসর নিতে হয়েছে। বাড়িতেই থাকেন এবং নিজের শয়নকক্ষ থেকে প্রচণ্ড দাপটে বাড়ি শাসন করেন।

ঠাকুরদা ছাড়া বাড়িতে আছেন দীপার বাবা-মা এবং দাদা। বাবা নীলমাধব বয়স্ক লোক, কলেজে অধ্যাপনা করেন। মা গোবেচারি ভালমানুষ, কারুর কথায় থাকেন না, নীরবে সংসারের কাজ করে যান। দাদা বিজয়মাধব দীপার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, সে সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পাস করে কলেজে অধ্যাপনার কাজে ঢোকবার চেষ্টা করছে। দীপার বাবা এবং দাদা দু'জনেই তেজস্বী পুরুষ। কিন্তু তাঁরা বাড়িতে উদয়মাধবের হুকুম বেদবাক্য মনে করেন এবং বাইরে বংশ-গৌরবের ধ্বজ তুলে বেড়ান। বংশটা একাধারে সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রাচীনপন্থী।

এই বংশের একমাত্র মেয়ে দীপা। তাকে মেয়ে-স্কুল থেকে সীনিয়র কেমব্রিজ পাস করানো হয়েছিল। তারপর তার পড়াশুনো বন্ধ হল; তার জন্যে পালটি ঘরের ভাল পাত্র খোঁজা আরম্ভ হল। কাল ধর্মে তাকে পদার মধ্যে আবদ্ধ রাখা গেল না বটে, কিন্তু একলা বাইরে যাবার হুকুম নেই। বাইরে যেতে হলে বাপ কিংবা ভাই সঙ্গে থাকবে।

দীপা বাড়িতেই থাকে, গৃহকর্মে রান্নাঘরে মাকে সাহায্য করে; অবসর সময়ে গল্প উপন্যাস পড়ে, রেডিওতে গান শোনে। কিন্তু মন তার বিদ্রোহে ভরা। তার মনের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, নিজস্ব মতামত আছে; সে মুখ বুজে বাড়ির শাসন সহ্য করে বটে, কিন্তু তার মনে সুখ নেই। মেয়ে হয়ে বাংলা দেশে জন্মেছে বলে কি তার কোনো স্বাধীনতা নেই! অন্য দেশের মেয়েদের তো আছে।

ঠাকুরদা উদীয়মাধব, পঙ্গুতার জন্যেই বোধ হয়, বাড়িতে বন্ধুসমাগম পছন্দ করতেন, লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। একটা কোনো উপলক্ষ পেলেই নিজের প্রবীণ

বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন; নীলমাধব এবং বিজয়মাধবের বন্ধুরাও নিমন্ত্রিত হতেন। বৃদ্ধের তিনতলায় সমবেত হতেন, প্রৌঢ় অধ্যাপকেরা বসতেন দোতলায় এবং একতলায় বৈঠকখানায় বসে ছেলে-ছোকরার দল গানবাজনা হইহুল্লোড় করত। মাসে দু'মাসে এইরকম অনুষ্ঠান লেগেই থাকত।

দীপা অতিথিদের সকলের সামনে বেরুত, কোনো বারণ ছিল না। ঠাকুরদার বন্ধুরা নাতনী সম্পর্কে তার সঙ্গে সেকেলে রসিকতা করতেন, বাপের বন্ধুরা তাকে স্নেহ করতেন, আর দাদার বন্ধুরা তাকে নিজেদের সমান মর্যাদা দিত, মেয়ে বলে অবহেলা করত না। সে প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে দু'টি-চারটি কথাও বলত। তাদের মধ্যে যখন গানবাজনা হত তখন সে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে শুনত। এইসব ক্রিয়াকর্মে তার মন ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদিও বাইরে তার বিকাশ খুব অল্পই চোখে পড়ত। দীপা ভারি চাপা প্রকৃতির মেয়ে।

এইভাবে চলছিল, তারপর একদিন দীপার মানসলোকে একটি ব্যাপার ঘটল, নবযৌবনের স্বভাবধর্মে সে প্রেমে পড়ল। যার সঙ্গে প্রেমে পড়ল সেও তার অনুরাগী। কিন্তু মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, প্রেমিকের জাত আলাদা।

দুপুরবেলা যখন বাড়ি নিষুতি হয়ে যায়। তখন দীপা নীচের বসবার ঘরে দোর ভেজিয়ে দিয়ে টেলিফোনের সামনে বসে, চোখে প্রতীক্ষ নিয়ে বসে থাকে। টেলিফোন বাজিলেই সে যন্ত্র তুলে নেয়। সাবধানে দু'টি-চারটি কথা হয়, তারপর সে টেলিফোন রেখে দেয়। কেউ জানতে পারে না।

সন্ধ্যেবেলা দীপা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে; সামনের ফুটপাথ দিয়ে তার প্রেমিক চলে যায়, তার পানে চাইতে চাইতে যায়। এইভাবে তাদের দেখা হয়। কিন্তু কাছে এসে দেখা করার সুযোগ নেই, সকলে জানতে পারবে।

এদিকে দীপার জন্যে পাত্রের সন্ধান শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু পালটি ঘর যদি পাওয়া যায় তো পাত্র পছন্দ হয় না, পাত্র যদি পছন্দ হয় তো ঠিকুজি কোষ্ঠীর মিল হয় না। বিয়ের কথা মোটেই এগুচ্ছে না।

পৌষ মাসের শেষের দিকে একদিন দুপুরবেলা দীপা টেলিফোনে তার প্রেমিকের সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করল, তারপর কোমরে। আচল জড়িয়ে তেতলায় ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

দীপা সাহসিনী মেয়ে, কিন্তু তার সাহসের সঙ্গে খানিকটা একওঁয়েমি মেশানো আছে। ঠাকুরদার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় বিচিত্র; সে ঠাকুরদাকে যত ভালবাসে, বাড়িতে আর কাউকে এত ভালবাসে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ঠাকুরদাকে ভয়ও করে। তিনি তার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হবেন। এ কথা ভাবতেই সে ভয়ে কাটা হয়ে যায়। তাই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে তার উরু আর হটু অল্প কাঁপতে লাগল।

উদয়মাধব মুখুজে একদিন বুড়ো বয়সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান, তাঁর মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত লাগে। এই আঘাতের ফলে তাঁর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু

হয়ে যায়, চলে ফিরে বেড়াবার ক্ষমতা আর থাকে না। এ ছাড়া তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই। দোহারা গড়নের শরীর, মুখের চওড়া চোয়ালে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। সত্তর বছর বয়সেও মানসিক শক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। যে দাপট নিয়ে তিনি কলেজের অধ্যক্ষতা করতেন। সেই দাপট পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। তাঁর চিরদিনের অভ্যাস হুঙ্কার দিয়ে কথা বলা। এখনো তিনি হুঙ্কার দিয়েই কথা বলেন।

দীপা তেতলায় দাদুর ঘরে ঢুকে দেখল তিনি বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। তিনি প্রত্যহ দু'টি খবরের কাগজ পড়েন; সকালবেলা ইংরেজি কাগজ আর দুপুরে দিবানিদ্রার পর বাংলা।

দীপাকে দেখে উদয়মাধব কাগজ নামালেন, হুঙ্কার দিয়ে বললেন–'এই যে দীপঙ্করী। আজকাল তোমাকে দেখতে পাই না কেন? কোথায় থাকো?'

দীপার নাম শুধুই দীপা, কিন্তু উদয়মাধব তাকে দীপঙ্করী বলেন। ঠাকুরদার চিরপরিচিত সম্ভাষণ শুনে তাঁর ভয় অনেকটা কমল, সে খাটের পায়ের দিকে বসে বলল–'আজ সকালেই তো দেখেছেন দাদু! আমি আপনার চা আর ওষুধ নিয়ে এলুম না?

উদয়মাধব বললেন–'ওহে, তাই নাকি! আমি লক্ষ্য করিনি। তা এখন কী মতলব?'

দীপা হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না, মাথা হেঁট করে বসে রইল। যে কথা বলতে এসেছে তা সহজে বলা যায় না।

উদয়মাধব কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে অপেক্ষা করলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ হুঙ্কার ছাড়লেন–'কী হয়েছে?'

দীপা তার মনের সমস্ত সাহস একত্র করে দাদুর দিকে ফিরল, তাঁর চোখে চোখ রেখে ধীরস্বরে বলল—'দাদু, আমি একজনকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু তার জাত আলাদা। আপনার আপত্তি আছে?'

উদয়মাধব ক্ষণেকের জন্যে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তারপর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে হুঙ্কার দিলেন–'কি বললে, একজনকে বিয়ে করতে চাও! এসব আজকাল হচ্ছে কি? নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করবে! তুমি কি ম্লেচ্ছ বংশের মেয়ে?'

দীপা নতমুখে চুপ করে বসে রইল। উদীয়মাধব হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিয়ে বক্তৃতা চালাতে লাগলেন। একটানা হুঙ্কার শুনে নীচে থেকে দীপার মা আর দাদা বিজয়মাধব ছুটে এল, দু-একটা ঝি-চাকরও দোরের কাছ থেকে উঁকি ঝুকি মারতে লাগল। দীপা কাঠ হয়ে বসে রইল।

আধা ঘণ্টা পরে লেকচার শেষ করে উদয়মাধব বললেন—'আর যেন কোনো দিন তোমার মুখে এ কথা শুনতে না পাই। তুমি এ বংশের মেয়ে, আমার নাতনী, আমি দেখেশুনে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব তাকেই তুমি বিয়ে করবে। যাও।'

দীপা নীচে নেমে এল; বিজয়ও তার সঙ্গে সঙ্গে এল। দীপা নিজের শোবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, বিজয় কটমট তাকিয়ে কড়া সুরে বলল—'এই শোন। কাকে বিয়ে করতে চাস?'

জ্বলজ্বলে চোখে দীপা ফিরে দাঁড়াল, তীব্র চাপা স্বরে বলল–'বলব না। মরে গেলেও বলব না।' এই বলে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দোর বন্ধ করে দিল।

অতঃপর দীপা বাড়িতে প্রায় নজরবন্দী হয়ে রইল। আগে যদি-বা দু-একবার নিজের সখীদের কাছে যাবার জন্য বাড়ির বাইরে যেতে পেত, এখন আর তাও নয়। সর্বদা বাড়ির সবাই যেন শতচক্ষু হয়ে তার ওপর নজর রেখেছে। কেবল দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্যে সে দৃষ্টিবন্ধন থেকে মুক্তি পায়। তার মা নিজের ঘরে গিয়ে একটু চোখ বোজেন, তার দাদা বিজয় কাজের তদবিরে বেরোয়। বাবা নীলমাধব দশটার আগেই কলেজে চলে যান, ঠাকুরদা তেতলায় নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকেন। সুতরাং দীপকে কেউ আগলাতে পারে না। দীপাও বিদ্রোহের কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না।

বস্তুত বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছিল, পিতামহের লেকচার শুনে দীপার দিব্যজ্ঞান হয়েছে, সে আর কোনো গোলমাল করবে না। দুপুরবেলা যে টেলিফোন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা কেউ জানে না।

তারপর একদিন—

ঘটনাচক্রে বিজয় দুপুরবেলা সকাল সকাল বাড়ি ফিরছিল। সে আজ যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তার দেখা পায়নি, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে দেখতে পেল, দীপা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। বিজয়ের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। একলা দীপা কোথায় যাচ্ছে! দীপার বান্ধবী শুভ্রার বাড়িতে? কিন্তু শুভ্রার বাড়ি তো এদিকে নয়, ঠিক উল্টো দিকে; অন্য কোনো বান্ধবীও এদিকে থাকে না। বিজয় সজোরে পা চালিয়ে দীপাকে ধরবার উদ্দেশ্যে চলল।

'এই, কোথায় যাচ্ছিস?'

তীরবিদ্ধের মত দীপা ফিরে দাঁড়াল। সামনেই দাদা। বিজয় কড়া সুরে বলল—'একলা কোথায় যাচ্ছিস?'

দীপার মুখে কথা নেই; সে একবার ঢোক গিলল। বিজয় গলা আরো চড়িয়ে বলল—'কার হুকুমে একলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস? চল, ফিরে চল।'

এবার দীপার মুখ থেকে কথা বেরল–'যাব না।'

রাস্তায় বেশি লোক চলাচল ছিল না, যারা ছিল তারা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লাগল। দীপা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিজয় বলল–'ভাল কথায় যাবি, না চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাব?

দীপার বুক ফেটে কান্না এল। রাস্তার মাঝখানে এ কি কেলেঙ্কারি! এখনি হয়তো চেনা লোক কেউ দেখতে পাবে। দীপা কোনো মতে দুরন্ত কান্না চেপে বঁড়শির মাছের মত বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

বিজয় বাড়িতে ঢুকে 'মা মা' বলে দু'বার ডাক দিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকাল; দীপা আর দাঁড়াল না, দোতলায় উঠে নিজের ঘরে দোর বন্ধ করল।

বিজয় বসবার ঘরে ঢুকতেই তার নজরে পড়ল টেলিফোন যন্ত্রের নীচে এক টুকরো সাদা কাগজ চাপা রয়েছে। কাছে গিয়ে কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়ল, তাতে লেখা রয়েছে–'আমি যাকে বিয়ে করতে চাই তার সঙ্গে চলে যাচ্ছি। তোমরা আমার খোঁজ করো না।—দীপা।

এতটা বিজয়ও ভাবতে পারেনি। সে চিঠি নিয়ে সটান ঠাকুরদার কাছে গেল। বাবা-মাও জানতে পারলেন। কিন্তু ঝি-চাকরের কাছে কথাটা লুকিয়ে রাখতে হল। উদীয়মাধব গুম হয়ে রইলেন, হুঙ্কার দিয়ে বক্তৃতা করলেন না। ভিতরে ভিতরে দীপার ওপর পীড়ন চলতে লাগল-যার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল, সে কে? নাম কি? দীপা কিন্তু মুখ টিপে রইল, নাম বলল না।

নিভৃত পারিবারিক মন্ত্রণায় স্থির হল, সবাগ্রে দীপার বিয়ে দেওয়া দরকার; যেখান থেকে হোক পালটি ঘরের সৎ পাত্র চাই। আর দেরি নয়।

বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে বিজয়ের দুশ্চিন্তা বেশি। তার স্বভাব একটু তীব্র গোছের। তার বোন কোনো অজানা লোকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এ লিজা যেন তারই সবচেয়ে মমন্তিক। সে উঠে পড়ে লেগে গেল পাত্র খুঁজতে।

পাড়ার নৃপতি লাহার বাড়িতে কয়েকটি যুবকের আড়া বসত, আগে বলা হয়েছে। বিজয় এই আড্ডায় আসত, এখানে অন্য যারা আসত তাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, নৃপতি লাহার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল।

নৃপতি লাহারা সাত পুরুষে বড়মানুষ, কিন্তু বর্তমানে সে ছাড়া বংশে আর কেউ নেই। তার বয়স এখন আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর, নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হবার পর আর বিয়ে করেনি। সে উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, সারা দিন লেখাপড়া নিয়ে থাকে, সন্ধ্যের পর আড্ডা জমায়।

বিজয়ামাধব একদিন বিকেলবেলা নৃপতির কাছে এল। তখনো আডা জমার সময় হয়নি, নৃপতি বাড়ির নীচের তলার বৈঠকখানায় বসে একখানা বই পড়ছিল। এই ঘরটিতেই রোজ আড্ডা বসে।

ঘরটি প্রকাণ্ড, সভাঘরের মত। সাবেক কালে এই ঘরে বাবুদের নাচগানের মুজরো বসন্ত, একালে ঘরটি সোফা চেয়ার প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে ড্রয়িংরুমে পরিণত করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালের গদিন-মোড়া তক্তপোশ এখনো আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। তা ছাড়া

টেবিল-হারমোনিয়াম আছে, পিয়ানো আছে, রেডিওগ্রাম আছে। আর আছে তাস পাশা ক্যারাম প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম।

বিজয় ঘরে ঢুকে দেখল নৃপতি একলা আছে, বলল–'নৃপতিদা, তোমার সঙ্গে আড়ালে একটা পরামর্শ আছে, তাই আগেভাগে এলাম।'

নৃপতি বই মুড়ে বিজয়কে একটু ভাল করে দেখল, তারপর সোফায় নিজের পাশে হাত চাপড়ে বলল—'এস, বসো।'

বিজয় তার পাশে বসে কথা বলতে ইতস্তত করছে দেখে নৃপতি বলল—'কিসের পরামর্শ?'

বিজয় তখন বলল–'নৃপতিদা, দীপার জন্যে পাত্র খোঁজ হচ্ছে কিন্তু মনের মত পাত্র কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি তো অনেক খবর রাখো। একটা ভাল পাত্রের সন্ধান দাও না।'

নৃপতি হাত বাড়িয়ে নিকটস্থ টেবিল থেকে সিগারেটের টিন নিল, একটি সিগারেট ঠোঁটে ধরে বলল-ই। দীপার এখন বয়স কত?

'সতেরো। আমাদের বংশে—'

নৃপতি দেশলাই জ্বালাবার উপক্রম করে বলল–'তোমাদের বংশের কথা জানি। গৌরীদান করতে পারলেই ভাল হয়। তা কি রকম পাত্র চাও? বিদ্বান হবে, পয়সাকড়ি থাকবে, চেহারা ভালো হবে, এই তো?'

বিজয় বলল—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আসল কথাটাই বললে না। পালটি ঘর হওয়া চাই।'

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নৃপতির ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গহাসি খেলে গেল। সে বলল–'তাও তো বটে। বংশের ধারা বজায় রাখতে হবে বইকি। তা তোমরা হলে গিয়ে মুখুজ্জে, সুতরাং চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে গাঙ্গুলি কিংবা ঘোষাল চাই। বারেন্দ্র চলবে না?

'না, নৃপতিদা, জানোই তো আমরা আজ পর্যন্ত সাবেক চাল বজায় রেখে চলেছি।'

'জানি বইকি! তোমরা হচ্ছে আরশোলা গোষ্ঠীর জীব।'

'আরশোলা গোষ্ঠীর জীব মানে?'

'আরশোলা অতি প্রাচীন জীব, কোটি কোটি বছর আগে জন্মেছিল; তারপর জীবজগতে অনেক বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আরশোলা আরশোলাই রয়ে গেছে। তাই আজকাল আর তাদের বেশি কদর নেই।'

'সে যাই বল, বর্ণাশ্রম ধর্ম আমি মেনে চলি। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, চাতুর্বর্ণ্যং—' নৃ

পতি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল; সিগারেট টানতে টানতে সে বোধ করি মনে মনে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিল। সিগারেট শেষ করে সে বলল—'একটি ছেলে আছে, কিন্তু তোমাদের পালটি ঘর কিনা খোঁজ নিতে হবে। তুমি আজ বাড়ি যাও, কাল খবর পাবে।'

'আচ্ছা, বলে বিজয় চলে গেল। নৃপতি কব্জির ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজেছে। সিগারেটের টিন পকেটে নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তার গন্তব্যস্থল বেশি দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

দেবাশিসের সদর দরজার ঘণ্টি টিপতেই নকুল এসে দোর খুলল। নৃপতি বলল–'দেবাশিসবাবু আছেন?'

নকুল বলল–'আজ্ঞে, তিনি এইমাত্র ফেক্টরি থেকে বাড়ি ফিরেছেন–'

এই সময় দেখা গেল দেবাশিস সিড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সে সদর দোরের কাছে এলে নৃপতি একটু হেসে বলল—'আমাকে আপনি চিনবেন না, আপনার বাবা শুভাশিসবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। আমার নাম নৃপতি লাহা।'

দেবাশিসের মুখেও হাসি ফুটল—'আপনাকে চিনি না বটে, কিন্তু নাম জানি। আপনার বাড়িও দেখেছি। আসুন।' সে নৃপতিকে বসবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে থমকে

ফিরে দাঁড়িয়ে বলল–'বসবার ঘরে না গিয়ে চলুন খাবার ঘরে যাই। চায়ের সময় হয়েছে।'

নৃপতি বলল—'বেশ তো।'

দু'জনে খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলে বসল। দেবাশিস বলল—'নকুল, আমাদের চা জলখাবার দাও।'

নৃপতি বলল–'আমার চা হলেই চলবে।'

খেতে খেতে দু'জনের কথা হতে লাগল। বছর ছয়-সাত আগে দেবাশিসের বাবার সঙ্গে নৃপতির পরিচয় হয়েছিল; দেবাশিস তখন কলকাতায় থাকত না, দিল্লীতে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল। শুভাশিসবাবু একদিন নৃপতির বাড়ির সামনে ফুটপাথের ওপর পা পিছলে পড়ে যান, নৃপতি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট এড় দিয়েছিল। তারপর শুভাশিসবাবু তাঁর ফ্যাক্টরিতে তৈরি প্রচুর কেশতৈল সাবান কোল্ড ক্রিম প্রভৃতি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তার বাড়িতে এসে তত্ত্ব-তল্লাশ নিতেন। বছর দুই পরে তিনি যখন মারা গেলেন তখন নৃপতি খবর পেল না, একেবারে খবর পেল মাস তিনেক পরে। এমনি কলকাতা শহর। শুভাশিসবাবুর মৃত্যু-সংবাদ নৃপতিকে জানাবে এমন লোক কেউ ছিল না।

দেবাশিস দিল্লীতে তার বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে কলেজে পড়াশুনো করছিল। বাল্যকালেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। বাবার বন্ধুটি ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা বিজ্ঞান-অধ্যাপক। দেবাশিস এম. এস-সি. পাস করে দিল্লী থেকে চলে এল। তার মাসখানেক পরেই তার বাবা মারা গেলেন।

নৃপতি প্রশ্ন করল–'আপনার বাড়িতে আর কে আছে?'

দেবাশিস বলল–'আর কেউ নেই, আমি একা। কিংবা আমি আর নকুল বলতে পারেন। নকুল এ বাড়িতে আমি জন্মাবার আগে থেকে আছে।'

'বিয়ে করেননি?'

লেখাপড়া শেষ করে ফিরে আসার পরই বাবা মারা গেলেন, তারপর আর হয়ে ওঠেনি।'

'হুঁ। ভাল কথা, আপনার উপাধি যখন ভট্ট তখন নিশ্চয় ব্রাহ্মণ। গোত্র জানা আছে কি?'

'যখন পাইতে হয় শুনেছিলাম শাণ্ডিল্য গোত্র। বাড়ুজে।'

'বা, বেশ। আচ্ছা, আমি যদি ঘটকালি করি, আপনার আপত্তি হবে কি?'

দেবাশিস মুখে টিপে একটু হাসল, উত্তর দিল না। নকুল এতক্ষণ ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, এখন এগিয়ে এসে বলল-'হ্যাঁ বাবু, আপনি করুন। ঘরে একটি বউ দরকার। আমি বুড়ো মানুষ আর কত দিন সংসার চালাব।'

'তাই হবে।' নৃপতি চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। —'আজ চলি। আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা বসে, পাড়ার ছেলেরা আসে। আপনিও আসেন না কেন?'

'আচ্ছা, যাব।'

'আজই চলুন না!' দেবাশিস একটু ইতস্তত করে বলল—'আজই? বেশ, চলুন।'

দু'জনে বেরুল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নৃপতির বাড়ির সামনে এসে তারা শুনতে পেল বৈঠকখানায় কেউ লঘু আঙুলের স্পর্শে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

বৈঠকখানা ঘরে তিনটে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কেবল একটি মানুষ ঘরে আছে, দেয়াল-ঘেঁষা পিয়ানোর সামনে বসে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে।

নৃপতি দেবাশিসকে নিয়ে ঘরে ঢুকল, বলল–'ওহে প্রবাল, দ্যাখো, আমাদের আডায় একটি নতুন সভ্য পাওয়া গেছে। এঁর নাম দেবাশিস ভট্ট।'

প্রবাল নামধারী যুবক পিয়ানো থেকে উঠে এল। নিরুৎসুক স্বরে বলল—'পরিচয় দেবার দরকার নেই।'

নৃপতি বলল–'আগে থাকতেই পরিচয় আছে নাকি?'

প্রবাল বলল–'সামান্য। গরীবের সঙ্গে বড়মানুষের যতটুকু পরিচয় থাকা সম্ভব ততটুকুই।'

প্রবাল আবার পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসল। টুং-টাং করে একটা সুর বাজাতে লাগল। তার ভাবভঙ্গী দেখে বেশ বোঝা যায় দেবাশিসকে দেখে খুশি হয়নি। সে বয়সে দেবাশিসের চেয়ে দু'এক বছরের বড়, মাঝারি দৈর্ঘ্যের বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের গড়নে বৈশিষ্ট্য না থাকলেও জৈব আকর্ষণ আছে; চোখের দৃষ্টি অপ্রসন্ন। কিন্তু তার চেহারা যেমনই হোক সে ইতিমধ্যে গায়ক হিসেবে বেশ নাম করেছে। তার কয়েকটা গ্রামোফোন রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়েছে; রেডিও থেকেও মাঝে মাঝে ডাক পায়।

প্রবালের সঙ্গে দেবাশিসের অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। এক সময় তারা একসঙ্গে স্কুলে পড়ত, ভাবসাব ছিল; তারপর দেবাশিস স্কুল থেকে পাস করে দিল্লীতে পড়তে চলে গেল। কয়েক বছর পরে এই প্রথম দেখা। এই কয় বছরের মধ্যে দেবাশিসের বাবা 'প্রজাপতি প্রসাধন নামে শৌখিন টয়লেট দ্রব্যের কারখানা খুলে বড়মানুষ হয়েছেন। আর প্রবালের বাবা হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যাওয়ার ফলে তাদের সম্পন্ন অবস্থার খুবই অধোগতি হয়েছে। প্রবাল গান গেয়ে কোনো মতে টিকে আছে।

প্রবালের কথা বলার ভঙ্গীতে দেবাশিস বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, নৃপতি তাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে সোফায় পাশাপাশি বসে গল্প করতে লাগিল। বলল–'আমার আড়ডায় পাঁচ-ছয়জন আসে। কিন্তু সবাই রোজ আসে না। আজ আরো দু-তিনজন আসবে।'

নৃপতি দেবাশিসের সামনে সিগারেটের টিন খুলে ধরল, দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল–'ধন্যবাদ। আমি খাই না।'

নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নৃপতি খাটো গলায় বলল–'প্রবাল গুপ্ত গাইয়ে-বাজিয়ে লোক, একটু বেশি সেনসিটিভ, আপনি কিছু মনে করবেন না। ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এই সময় বাইরে থেকে একটি যুবক সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সিঙ্কের লম্বা প্যান্ট ও বুশ-কোট পরা সুগঠিত সুদর্শন চেহারা, ধারালো মুখে আভিজাত্যের ছাপ, বেশ দৃঢ় চরিত্রের ছেলে বলে মনে হয়, বয়স চব্বিশ-পাঁচিশ। তাকে দেখে নৃপতি বলল—'এই যে কপিল। এস পরিচয় করিয়ে দিই। কপিল বোস-দেবাশিস ভট্ট।'

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পর কপিল বলল—'নৃপতিদা, তোমার টেলিফোন একবার ব্যবহার করব। রাস্তায় আসতে আসতে একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল।'

'হ্যাঁ হ্যা, নিশ্চয়।'

কপিল পাশের ঘরে চলে গেলে নৃপতি বলল—‘কপিল ছেলেটা ভাল, বাপ অগাধ বড়মানুষ, কিন্তু ওর কোনো বদখেয়াল নেই। লেখাপড়া শিখেছে, টেনিস বিলিয়ার্ড খেলে দিন কটায়, রাত্তিরে দূরবীন লাগিয়ে আকাশের তারা গোনে। কেবল একটি দোষ, বিয়ে করতে চায় না।’

প্রবাল হঠাৎ পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নৃপতির দিকে তাকিয়ে বলল–’আজ চললাম নৃপতিদা।’ দেবাশিসকে সে লক্ষ্যই করল না।

নৃপতি বলল—’চললে? এত সকাল সকাল? রেডিওতে গাইতে হবে বুঝি? কাগজে যেন দেখেছিলাম আজ রাত্রে তোমার প্রোগ্রাম আছে।’

প্রবাল বলল–’প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু গান আগেই রেকর্ড হয়ে গেছে, আমাকে স্টুডিও যেতে হবে না। আমি বাসায় যাচ্ছি।’

নৃপতি বলল–’বাসায় যাচ্ছ। তোমার বউ-এর খবর ভাল তো?’

প্রবাল উদাস স্বরে বলল—’তোমাদের বলিনি নৃপতিদা, বউ মাসখানেক আগে মারা গেছে। হার্টের রোগ নিয়ে জন্মেছিল; ডাক্তারেরা বলে বারো-চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে অপারেশন না করালে এ রোগে কেউ একুশ-বাইশ বছরের বেশি বাঁচে না। আমার শ্বশুর রোগ লুকিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল।–আচ্ছা, চললাম।’

নৃপতি ও দেবাশিস স্তব্ধ হয়ে রইল। স্ত্রী মারা গেছে। অথচ আড্ডার কাউকে কিছু বলেনি; আপন মনে পিয়ানো বাজায় আর চলে যায়। নৃপতি জানত প্রবালের স্ত্রীর মরণাে‌স্তক রোগ, কিন্তু খবর শুনে হঠাৎ তার মুখে কথা যোগালো না।

এই সময় কপিল পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। সে প্রবালের কথাগুলো শুনতে পায়নি, তার দিকে তাকিয়ে বলল–'বেশ তো পিয়ানো বাজাচ্ছিলে, চললে নাকি? একটা গান শোনাও না।'

প্রবাল তীব্র বিদ্বেষভরা চোখে তার পানে চেয়ে রুদ্ধস্বরে বলল—'আমার গান বিনা পয়সায় শোনা যায় না। পয়সা খরচ করতে হয়।'

কপিল এরকম কড়া জবাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, সে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে হেসে উঠল। বলল–'পিয়সা খরচ করেই যদি গান শুনতে হয় তাহলে তোমার গান শুনব কেন? তোমার চেয়ে অনেক ভাল গাইয়ে আছে।'

প্রবাল আর দাঁড়াল না, হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কপিল একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল, নৃপতি অপ্রতিভা মুখে বলল–'আজ প্রবালের মেজাজটা ভাল নেই।'

কপিল বলল—'প্রবালের মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়ে থাকে। ধাতুগত বিকার।'

‘ওর স্ত্রী মারা গেছে।’

কপিল চিকিত হয়ে বলল–’তাই নাকি! আমি জানতাম না। ছিঃ ছি, অসভ্যতা করে ফেলেছি।’

নৃপতি বলল—’যাক গে। তুমি কেমন আছ বলে। কয়েকদিন তোমাকে দেখিনি।’

কপিল বলল–’গ্ল্যান করেছিলাম বাঙ্গালোরে বেড়াতে যাব, কিন্তু প্ল্যান ভেস্তে গেল।‘

‘ভেস্তে গেলি কেন?’

‘আমার সঙ্গে যার যাবার কথা ছিল সে যেতে পারল না। একলা বেড়িয়ে সুখ নেই।’

‘তা বটে। কিন্তু তুমি বিয়ে করছ না কেন? বিয়ে করলে তো একটি চিরস্থায়ী সহযাত্রী পাবে।’

কপিল হেসে উঠল, থিয়েটারী কায়দায় বাহু প্রসারিত করে বলল-কিবি বলেছেন, হব না। তাপস নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী। আমিও কবির দলে।’

নৃপতি বলল–’কিন্তু শুনেছি তোমার বাবা তপস্বিনী জোটাবার ক্রুটি করেননি, গোটা পঞ্চাশেক সুন্দরী তপস্বিনী দেখেছেন। একটিও তোমার পছন্দ হল না?

কপিল একটু গভীর হয়ে বলল—’সুন্দরী মেয়ে অনেক আছে নৃপতিদা, কিন্তু শুধু সুন্দরী হলেই তো চলে না। আমি এমন বউ চাই যার মন হবে আমার মনের সমান্তরাল, অর্থাৎ সমানধম।–কথাটা বুঝেছেন?’

‘বুঝেছি। তুমি হুঁশিয়ার লোক। তা নিজে পছন্দ করে বিয়ে কর না কেন? তোমার বাবা নিশ্চয় অমত করবেন না।’

কপিল হেসে বলল–’সেই চেষ্টাতেই আছি।’

তারপর সাধারণভাবে কথা হতে লাগিল। দেবাশিস এতক্ষণ কেবল নিশ্চেষ্ট শ্রোতা ছিল, এখন সেও কথাবার্তায় যোগ দিল। দেবাশিসের পূর্ণতর পরিচয় শুনে কপিল বলল—’আরে তাই নাকি! আপনিই প্রজাপতি প্রসাধন প্রডাক্টস? আমরা যে বাড়িসুদ্ধ আপনার তেল সাবান মো ক্রিম ব্যবহার করি। তা অ্যাদ্দিন আপনি ছিলেন কোথায়?’

দেবাশিস বলল–’এখানেই ছিলাম, কিন্তু নৃপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল না।’

আরো খানিকক্ষণ গল্পসল্প হল। চাকর এসে ছোট ছোট পেয়ালায় কফি দিয়ে গেল। ক্রমে আটটা বাজল। নৃপতি বলল—’আজ বোধ হয়। আর কেউ আসবে না।’

দেবাশিস বলল–’আজ উঠি।’

কপিল বলল–'এরি মধ্যে! আমাদের আড্ডা। নটা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলে।'

দেবাশিস হেসে বলল–'আবার আসব।'

নৃপতি জিজ্ঞেস করল—'কাল আসতে পারবেন?'

দেবাশিস বলল–'আচ্ছা, কাল আসব।'—

০৩. পরদিন দেবাশিস একটু দেরি করে এল

পরদিন দেবাশিস একটু দেরি করে এল। ইচ্ছে ছিল সাড়ে আটটা নটা পর্যন্ত থেকে গল্পগুজব করবে। বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা একলা বিজ্ঞানের বই আর সাময়িক পত্র পড়ে কাটে, এখানে নতুন লোকের সঙ্গ পাওয়া যাবে। প্রবালের অসামাজিক ব্যবহার সত্ত্বেও নৃপতির আড্ডাটি তার ভাল লেগে গিয়েছিল।

সাড়ে ছাঁটার সময় নৃপতির বৈঠকখানায় গিয়ে দেবাশিস দেখল প্রবাল পিয়ানোর সামনে বসে চাবির ওপর আঙুল বুলোচ্ছে, কপিল এবং আর একটি ছেলে তক্তপোশের পাশে বসে পাঞ্জা লড়ছে; নৃপতি এবং অন্য একটি যুবক পাশাপাশি বসে গল্প করছে। নৃপতি তাকে হাত তুলে ডাকল।

দেবাশিস কাছে গেলে নৃপতি বলল-'বসুন। এখানে। পরিচয় করিয়ে দিই। দেবাশিস ভট্ট-বিজয়ামাধব মুখুজে। বিজয় হচ্ছে অধ্যাপক বংশের ছেলে, সম্প্রতি সংস্কৃতে এম.এ. পাস করে অধ্যাপনার কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে।' দেবাশিসের পূর্ণ পরিচয় নৃপতি আগেই বিজয়কে দিয়েছিল, আর পুনরাবৃত্তি করল না।

বিজয় উৎসুক চোখে দেবাশিসকে দেখতে লাগল। নৃপতি তাদের মাঝখান থেকে উঠে পড়ল, বলল–'তোমরা গল্প কর, আমি আসছি।'

বিজয় দেবাশিসের দিকে একটু ঘেঁষে বসল। বলল—'এক পাড়াতে থাকি, অ্যাদ্দিন আলাপ-পরিচয় হয়নি, কি আশ্চর্য বলুন দেখি।' চেহারা দেখেই দেবাশিসকে তার পছন্দ হয়েছিল; দীপার উপযুক্ত বর।

যদিও কলকাতা শহরে পাশাপাশি বাস করেও আলাপ-পরিচয় না হওয়াতে আশ্চর্য কিছু নেই, তবু দেবাশিস হাসিমুখে বলল—'আশ্চর্য বইকি।'

ওদিকে কপিল আর অন্য ছেলেটির পাঞ্জা লড়া শেষ হয়েছিল, নৃপতি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল–'কি হে খড়্গা বাহাদুর, তোমার দেশে যাবার কথা ছিল না?

খড়্গা বাহাদুর প্রফুল্ল স্বরে বলল—'কথা তো ছিল নৃপতিদা, কিন্তু যাওয়া হল না।'

খড়্গা বাহাদুর নেপালী যুবক। তার মা বাঙালী। তাই তার মাতৃভাষাও বাংলা। চমৎকার চেহারা, যেমন পীতাভ সোনালী রঙ তেমনি লম্বা ছিপছিপে গড়ন। তার মুখে চোখে মঙ্গোলীয় রক্তের ছাপ। এত অল্প যে ধরা যায় না। বর্তমানে সে বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়; পায়ের কাছে বল পেলে সে যাদুকর বনে যায়। কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা ফুটবল ক্লাবের সে খেলোয়াড়। তার খেলা দেখবার জন্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক মাঠে জমা হয়। তার চরিত্রে বিন্দুমাত্র চালিয়াত নেই। উচ্চবংশের ছিল, কিন্তু ভারি কিয়ী। বয়স তেইশ কি চব্বিশ।

নৃপতি বলল–'কেন, যাওয়া হল না কেন?'

খড়্গা বাহাদুর বলল—'কাঠমাণ্ডুতে বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছিল, হঠাৎ তার পেলাম কীসব গণ্ডগোল হয়েছে, বিয়ে পেছিয়ে গেছে।'

নৃপতি বলল–'তার মানে এক বছরের ধাক্কা। ফুটবল সীজন এসে পড়ল, এরপর তুমি তো আর নেপালে গিয়ে বসে থাকতে পারবে না।'

খড়্গা বাহাদুর চোখে কৌতুক এবং মুখে বিষণ্নতা নিয়ে মাথা নাড়ল।

চাকর বড় একটি ট্রের ওপর কয়েক পেয়ালা কফি নিয়ে এল, সকলেই এক এক পেয়ালা তুলে নিল। এই সময় সদর দরজার কাছ থেকে আওয়াজ এল–'ওহে, আমিও আছি, আমার জন্যে এক পেয়ালা রেখো।'

একটি যুবক প্রবেশ করল। রজতগৌর বর্ণ, মুখের ছাঁচ কেষ্টনগরের পুতুলকেও হার মানায়; চোখ দু'টি উজ্জ্বল, ক্ষৌরিত মুখে একটা হাসি লেগে আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ।

নৃপতি বলল—'এস সুজন।'

সুজন মিত্র একজন উদীয়মান চিত্রনক্ষত্র; দু' তিনখানা ছবি করেই বেশ নাম করেছে। যেমন গভীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, তেমনি হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতাও আছে।

সবচেয়ে বড় কথা, হঠাৎ খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেও তার মেজাজ বিগড়ে যায়নি। নিজের কথা সাত কাহিন করে বলতে সে ভালবাসে না। বস্তুত তার সম্বন্ধে কেউ বড় কিছু জানে না। স্ত্রীজাতির প্রতি তার আসক্তির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। এমন কি সে বিবাহিত কি অবিবাহিত তাই কেউ জানে না। দক্ষিণ কলকাতার একান্তে একটি ছোট বাড়িতে একলা থাকে, বেশির ভাগ সময়ই হোটেলে খায়। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং অপ্রকট তার জীবন।

সুজন ট্রে থেকে টপ করে একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বলল–'ঠিক সময়ে এসেছি, আর একটু হলে ফাঁকি পড়তাম।'

কফিতে একটি চুমুক দিয়ে সে তার উজ্জ্বল অভিনেতার চোখ দু'টি ঘরের চারিদিকে ফেরাল, তারপর দেবাশিসকে দেখে হ্রস্ব কণ্ঠে বলল–'নৃপতিদা, নতুন অতিথির সমাগম হয়েছে দেখছি!'

নৃপতি বলল—'হ্যা, এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। খড়্গ, তুমিও এস।'

পরিচয় বিনিময়ের পর সুজন মিটমিটি হেসে বলল—'দেবাশিসবাবু, এখন বলুন দেখি আপনি ফুটবল খেলা দেখতে ভালবাসেন, না সিনেমা দেখতে ভালবাসেন?'

দেবাশিস বলল–'দুই-ই ভালবাসি। খেলার মাঠে এবং রূপালী পদায় আপনাদের দু'জনকে অনেকবার দেখেছি।'

তারপর সকলে মিলে খানিকক্ষণ হাসিগল্প চালাল। প্রবাল কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিল না, নিজের মনে টুং-টাং করে পিয়ানো বাজিয়ে চলল।

রাত আন্দাজ ন'টার সময় সভা ভঙ্গ হল। দেবাশিস বেশ প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরে এল।

এইভাবে কয়েকদিন কাটাবার পর এক রবিবার সকালবেলা বিজয়, তার বাবা নীলমাধব এবং নৃপতি দেবাশিসের বাড়িতে দেখা করতে এল। দেবাশিস তাদের খাতির করে নীচের তলায় বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো এবং নকুলকে চায়ের হুকুম দিল।

নীলমাধব মুখুজে অতিশয় গভীর প্রকৃতির লোক। তিনি আগে বিজয়ের মুখে দেবাশিস সম্বন্ধে সব কথা শুনেছিলেন এবং তত্ত্ব-তল্লাশও নিয়েছিলেন। পাত্রটিকে সৎপাত্র মনে হওয়ায় তিনি এখন স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। তিনি দেবাশিসকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করলেন এবং নৃপতির দিকে ঘাড় নেড়ে সন্তোষ জ্ঞাপন করলেন।

ইতিমধ্যে চা এসে পড়েছে। নৃপতি চা খেতে খেতে নিপুণভাবে বিয়ের প্রস্তাব তুলল। নৃপতির ঘটকালির দিকে বিশেষ দক্ষতা আছে।

আধা ঘন্টার মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল। দেবাশিসের ঠিকুজি কোষ্ঠী ছিল না। তাই জ্যোতিষের যোটক বাদ দিতে হল। নৃপতি বলল—'দেবাশিস, দীপকে তোমার

অপছন্দ হবে না জানি, তবু একবার দেখা দরকার। আজ বিকেলে আমি এসে তোমাকে এঁদের বাড়িতে নিয়ে যাব। কেমন?

দেবাশিস সম্মত হল। বলা বাহুল্য, এই কদিনে নৃপতি ও দেবাশিসের ঘনিষ্ঠত 'তুমি ও 'নৃপতিদার পর্যয়ে নেমেছে।

সেদিন অপরাহ্ণে নৃপতি এসে দেবাশিসকে দীপাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। বৈঠকখানা ঘরে আসর হয়েছিল; আড়ম্বর কিছু নয়, টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে এক গুচ্ছ ফুল, তক্তপোশের ওপর মখমলের আস্তরণ এবং মোটা তাকিয়া। বিজয় তাদের নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালো, তারপর নীলমাধব এসে দেবাশিসকে তেতলার ঘরে নিয়ে গেলেন। উদীয়মাধব তার সঙ্গে দুচারটে কথা বললেন; তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল ভাবী নাতজামাই দেখে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

তারপর নীলমাধব দেবাশিসকে নিয়ে আবার নীচে নেমে এলেন। পাঁচ মিনিট পরে বিজয় গিয়ে দীপকে নিয়ে এল, দীপা এসে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। পরনে আটপৌরে শাড়ি ব্লাউজ, কানে ছোট ছোট দু'টি সোনার আংটি, গলায় সরু হার, হাতে তিনগাছি করে চুড়ি। কনে দেখানো উপলক্ষে তাকে সাজগোজ করানো হয়নি, কিংবা সে নিজেই সাজগোজ করেনি। তার সারা দেহে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ। একবার সে পলকের জন্য চোখ তুলে দেবাশিসের দিকে চেয়ে আবার চোখ নীচু করল। ক্রূর ঋজু রেখার নীচে চোখের দৃষ্টি খর।

দেবাশিসের কিন্তু দীপাকে খুব ভালো লেগে গেল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা শূন্য সুকুম গুরু দীপকে দেখে তার মান মার্থের সঙ্গর হল মন হল একে ঐরূপে পেলে সে সুখী হবে।

দুমিনিট পরে বিজয় বলল–'দীপা, তুমি এবারে যাও। দেখা হয়েছে।'

দীপা চলে গেল। তারপর মিষ্টিমুখ করে দেবাশিস সলজ্জ সম্মতি জানাল।

দুহাপ্তার মধ্যে সব ঠিকঠাক, বিয়ে হয়ে গেল। এই দুহস্তার মধ্যে দীপা যে তার প্রেমিকের সঙ্গে চুপিচুপি টেলিফোন মারফত বাক্যালাপ করেছে সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও কেউ তা জানতে পারল না।'

বিয়ের রাত্রে কনের বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নৃপতির বাড়ির আড়াধারীরাও এল, কারণ তারা বিজয়ের বন্ধু। আবার বউভাতের রাত্রে যারা দেবাশিসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে এল তাদের মধ্যে প্রজাপতি ফ্যাক্টরির সাহাকারীদের সঙ্গে নৃপতির দলও এল, কারণ তারা দেবাশিসের বন্ধু। যাকে বলে, বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি।

দেবাশিসের বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই, দীপার কয়েকটি প্রতিবেশিনী সখী এসে ফুলশয্যা সাজিয়ে দিয়ে গেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ চলল। নৃপতির দলই আসর জমিয়ে রাখল। সুজন শুধুই চিত্রাভিনেতা নয়, সে নানারকম ম্যাজিক দেখাল। প্রবাল আজ আর কোনো অশিষ্টতা করল না, নিজে থেকেই গান গেয়ে শোনাল।

সকলেই নববধূকে নানা রকম উপহার দিল। নৃপতি দিল সোনার রিস্টওয়াচ, কপিল দিল দামী একটা ঝরনা কলম, খড়্গা বাহাদুর দিল নেপালে তৈরি ঝকঝকে ধারালো কুকরি ছোরা, প্রবাল দিল তার নিজের গাওয়া কয়েকটা গানের রেকর্ড, সুজন দিল একটি রূপোর সরস্বতী মূর্তি। দেবাশিসের ফ্যাক্টরির বন্ধুরাও যথাযোগ্য উপহার দিলেন।

বউভাতের উৎসব শেষে অতিথির দল যখন বিদায় নিল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। বুলি নীচের তলায় রইল। ভূত নকুল, আর দোতলায় দেবাশিস এবং দীপা। প্রথম মিলন শেষ রাত্রি।

অতিথিকে বিদায় দিয়ে দেবাশিস ওপরতলায় গিয়ে দেখল, সব ঘরে বড় বড় আলো জ্বলছে; বসবার ঘরের একটা চেয়ারে দীপা শক্ত হয়ে বসে আছে। দেবাশিস তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাশিসের স্বভাব, যা সম্ভাব্য তাই তার মন স্বীকার করে নেয়, বিলক্ষণতার দিকে সহজে তার দৃষ্টি পড়ে না। সে দীপার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধ হেসে বলল–'এস।'

দীপা চকিতে একবার চোখ তুলল; তার চোখে ভয়ের ছায়া। দেবাশিস ভাবল, কুমারী মনের স্বাভাবিক লজ্জা। সে দীপর পাশের চেয়ারে বসে তার হাতের ওপর হাত রাখল, বলল–'বারোটা বেজে গেছে, আর কতক্ষণ বসে থাকবে। চল, শোবার সময় হল।'

দীপা হাত সরিয়ে নিল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তবু যা বলবার তা বলতে হবে, আর দেরি করা চলবে না। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল–'আমি-আমি আলাদা শোব।'

দেবাশিসের মনে কৌতুকের সঙ্গে একটু বিস্ময় মিশল। কথাগুলো যেন একটু বেসুরো, ঠিক লজ্জার মত নয়। তবু সে হাসিমুখেই বলল—’তুমি আলাদা শুলে ফুলশয্যা হবে কি করে?

দীপার শরীর কেঁপে উঠল; সে শরীরের সমস্ত স্নায়ু পেশী শক্ত করে বলল–না–নাআমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি-?

এবার দেবাশিসের মন থেকে কৌতুকের ভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ স্থির চোখে দীপার। পানে চেয়ে থেকে বলল–’কি কথা বলতে চাও?’

দীপার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল, সে কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল–’আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।’

কথাটার ভাবার্থ দেবাশিসের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল, তারপর তার মনে যে দীপ জ্বলেছিল, তা আস্তে আস্তে নিবে গেল; তার মনে হল, ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোটাও যেন কমে কমে পিদিমির চেয়েও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সে দীপার। পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শুষ্ক প্রশ্ন করল—’তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন?’

দীপা ঘাড় গুজে বসে রইল, কেবল তার অন্তরের ব্যাকুলত কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হ'ল–'আমি দোষ করেছি, কিন্তু আমার উপায় ছিল না। বাড়ির লোক জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে।'

'যাকে ভালবাস তাকে বিয়ে করলেই পারতে।'

'জাত আলাদা, তাই–'

'জাত।' একটা কঠিন হাসি দেবাশিসের মনের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে স্থির হল–'তা এখন কি করা যেতে পারে?'

দীপা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলল–'আমাকে আপনার বাড়িতে থাকতে দিন, আমি আপনাকে বিরক্ত করব না, আপনার সামনে আসব না—'তার গলা কান্নায় বুজে এল।

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে দেবাশিস নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালাল, বলল–'এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। সব কথা ভেবে দেখতে হবে। তুমি যাও, শোও গিয়ে।' সে ফুল দিয়ে সাজানো শয়নঘরের দিকে আঙুল দেখোল–'আমি অন্য কোথাও শোব।'

দীপা আর দাঁড়াল না, দ্রুত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তার চুলে তখনো ফুলের মালা জড়ানো, গলায় হাতে ফুলের গয়না। সেই অবস্থাতেই সে ফুল-ঢাকা বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। এত সহজে পরিত্রাণ পাবে তা সে আশা করেনি।

দোতলায় আর একটি শয়নকক্ষ ছিল, দেবাশিসের বাবা যে ঘরে শুতেন; নকুল সে ঘরও পরিষ্কার করেছিল, খাটের ওপর বিছানা পেতে সুজনি ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। বিয়ের শুভদিনে বাড়িতে কোথাও সে অপরিচ্ছন্নতা রাখেনি। দেবাশিস দীর্ঘকাল অব্যবহৃত এই ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ খাটের পাশে বসে রইল। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে, সে কক্ষসংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে কল খুলে মাথাটা কলের তলায় রাখল। তারপর ভিজে মাথায় ফিরে এসে আলো নিভিয়ে বিছানার সুজনির ওপরেই শুয়ে পড়ল।

রেল গাড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যখন লাইনের বাইরে লাফিয়ে পড়ে তখন কাউকে নোটিস দেয় না; দেবাশিসের জীবনে তেমনি আজ এই মহাদুর্যোগ এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে; দু’ মিনিট আগেও এই দুযোগের কোনো আভাস সে পায়নি। কিন্তু আত্মহারা হয়ে বিপথে কুপথে ছুটোছুটি করলে চলবে না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে-চিন্তে সুবুদ্ধির পথ বেছে নিতে হবে।

দেবাশিস জটিল চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। সে শান্ত ধীর প্রকৃতির মানুষ, অন্য কেউ হলে আজ রাত্রেই একটা কাণ্ড করে বসত।

দীপা অন্য একজনকে ভালবাসে, এইটেই হচ্ছে মূল কথা। দীপা কাকে ভালবাসে, সে লোকটা কে, তা জানিবার আগ্রহ দেবাশিসের নেই; সে যেই হোক না কেন, দীপা তাকে ভালবাসে। তবু দীপা পারিবারিক চাপে পড়ে দেবাশিসকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এই বিয়েকে সে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কে পরিণত করতে চায় না। . প্রেমাস্পদের সঙ্গে দীপার ঘনিষ্ঠতা কত দূর অগ্রসর হয়েছিল? জল্পনা নিষ্ফল।

দীপার বাড়ির সকলেই অবশ্য দীপার অসবর্ণ প্রণয়ের কথা জানে, বিজয়মাধব জানে। জেনে-শুিনে তারা এই কাজ করেছে। হয়তো ভেবেছে, বিয়ের পর দীপা ক্রমে তার প্রণয়ীকে ভুলে যাবে। কিন্তু দীপা ভুলবে বলে মনে হয় না, প্রণয়ীর প্রতি তার একনিষ্ঠা আছে। ...নৃপতি কি জানে? বোধ হয় জানে না, জানলে দেবাশিসের এমন অনিষ্ট করত না; নৃপতিকে সজ্জন বলেই মনে হয়। ...কিন্তু যা হবার তা তো হয়েছে, এখন এই জট ছাড়াবার উপায় কি? ডিভোর্স? একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল। এতক্ষণ পরে দেবাশিস লক্ষ্য করল, বসবার ঘরে তীব্র শক্তির আলোটা জ্বলেই চলেছে। সে উঠে আলোটা নেবাতে গেল। দীপার ঘরের দরজা বন্ধ; দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একটু থেমে কান পেতে শুনল, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোনো শব্দ এল না; দীপা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বসবার ঘরের আলো নিবিয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল।

ঝাঁ ঝাঁ রাত্রি। কলকাতা শহর নিঝুম হয়ে আছে। দূরে একটা রেলের ইঞ্জিন একটানা বাঁশী বাজাতে বাজাতে আরো দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। দেবাশিস অন্ধকারে চোখ মেলে শুধু ভাবছে–

তিনটে বেজে গেল। দেবাশিসের মনে হল, নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে এক বিন্দু জোনাকি আলো জ্বলছে আর নিবছে.একটা অর্ধ-পরিণত সংকল্প.তার বেশি আজ রাত্রে আর কিছু সম্ভব নয়...

দেবাশিস আবার বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল ঢালল, তারপর ফিরে এসে বিছানায় শোবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারল না, শরীরের ক্লান্তি কেটে যাবার পর ভোরের আলো ফুটতে-নো-ফুটতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সে মুখ ধুয়ে নীচে নেমে গেল। নকুল তখনো ওঠেনি, কাল রাত্রের খাটাখাটুনির পর আজ বোধ হয় একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবাশিস নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। শুকনো বাগানে ফুল নেই, কিন্তু ভোরের বাতাসটি বেশ মিঠে। সে সদর দরজা থেকে ফটক পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

একটু একটু করে দিনের আলো ফুটছে, কিন্তু এ রাস্তায় এখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। দেবাশিস পায়চারি করতে করতে এক সময় ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। বন্ধ ফটকের উপর কনুই রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, বাঁ দিক থেকে একজন লোক হন।হন করে আসছে। কাছে এলে সে চিনতে পারল-বিজয়মাধব।

বিজয়মাধবের সঙ্গে এই কয় দিনে দেবাশিসের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, উপরন্তু সে এখন তার শ্যালক। কিন্তু বিজয়কে আসতে দেখে তার মনটা গরম হয়ে উঠল। তাই বিজয় যখন মুখে হাসি ফুটিয়ে ফটকের ওপারে এসে দাঁড়াল তখন দেবাশিসের মুখে সে হাসির প্রতিবিম্ব পড়ল না, সে গম্ভীর চোখে বিজয়ের পানে চেয়ে বলল–'আবার কি জন্যে এসেছেন? কর্তব্যকর্ম কি এখনো শেষ হয়নি?'

বিজয়ের হাসি মিলিয়ে গেল, সে থতমত খেয়ে বলে উঠল—'দীপা কিছু বলেছে নাকি?'

দেবাশিস নীরস কণ্ঠে বল–'সবই বলেছে। সে অন্তত আমায় ঠকায়নি।'

বিজয় কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চেয়ে থেকে হঠাৎ ফাটক খুলে ভিতরে এল, তারপর দেবাশিসের হাত চেপে ধরে ব্যগ্র মিনতির স্বরে বলল–'ভাই দেবাশিস, তুমি দীপার স্বামী, তুমি আমার পরমাত্মীয়, আমার ছোট ভাইয়ের সমান। আমি একটা কথা বলব, শুনবে?'

'কি বলবেন বলুন।'

'দীপা একেবারে ছেলেমানুষ, সবে সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে, ওর মনে কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নেই। ওইটুকু মেয়ের বুদ্ধিই বা কতখানি? তুমি ভাই ওর কথায় কান দিও না। দুচার দিন ঘর করলেই আগের কথা সব ভুলে যাবে। কম বয়সের একটা খেয়াল বই তো নয়?'

‘ওর কথা শুনে তা তো মনে হয় না।’

‘মেয়েমানুষের কথার কি কোনো দাম আছে? ওরা আধুনিক কায়দায় বড় বড় কথা বলে, ভিতরে কিন্তু ফক্কিকার। দীপা স্কুলে পড়েছে, স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে মিশে পাকামি শিখেছে। ওর মনটা ভাবপ্রবণ; সিনেমা-থিয়েটার নাচগানের দিকে টান আছে, যদিও আমরা তাকে কোনোদিন আশকার দিইনি। আমি জোর গলায় বলছি, আমাদের বংশের মেয়ে কখনো বিপথে কুপথে যাবে না।’

দেবাশিস শান্ত গলায় বলল–’আপনার ভয় নেই, এ নিয়ে আমি ঝোঁকের মাথায় কোনো কেলেঙ্কারি কাণ্ড করব না, যা করবার ভেবে-চিন্তে করব। এ কথা বাড়ির বাইরে আর কেউ জানে?’

‘না।’ বিজয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির দোরের কাছে নকুলকে দেখা গেল। নকুল এগিয়ে এসে বলল-‘দাদাবাবু, চা তৈরি হয়েছে।’

বিজয় খাটো গলায় তাড়াতাড়ি বলল—’আচ্ছা ভাই, আজ আমি যাই। শীগগির আবার আসব।’ বলে সে দ্রুতপদে চলে গেল।

দেবাশিস বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল–’নকুল, তুই আমাদের চা ওপরের ঘরে দিয়ে আয়।’

নকুল মুচকি হেসে বলল—'তাই দিয়েছি দাদাবাবু!' দেবাশিস দোতলায় উঠে গেল। দেখল, বসবার ঘরে নীচু টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে আর দীপা তক্তপোশের পাশে চুপটি করে বসে আছে—কাল রাত্রে যেমন বসে ছিল। অবশ্য কাল রাত্রের বাসি জামাকাপড়, ফুলের গয়না আর নেই, তার বদলে পাট-ভাঙ্গা শাড়ি ব্লাউজ। দেবাশিস আসতেই দীপা একটু আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল।

দেবাশিস দোর বন্ধ করে দিয়ে দোরের সামনে ফিরে দাঁড়িয়ে দীপার। পানে তাকাল। খোলা জানালা দিয়ে সকালের নরম আলো দীপার ওপর পড়েছে। বিজয় যা বলেছিল তা মিথ্যে নয়, দীপার ছিপছিপে শরীরে কীেমার্যের কোমলতা এখনো লেগে আছে, ভারি ছেলেমানুষ মনে হয়। কিন্তু তার মুখে পরিণত মনের দৃঢ়তা, মুখের লাবণ্য যেন দৃঢ়তার উপাদানে তৈরি।

দেবাশিস কাছে এসে চায়ের সরঞ্জামের দিকে দৃষ্টি নামালো; টি-পটে চা, দু'টি পেয়ালা, গরম দুধ, চিনির কিউব, প্লেটে স্তুপীকৃত টোস্ট, মাখনের পাত্রে মাখন, অন্য একটি পাত্রে মারমালেড় এবং চারটি সিদ্ধ ডিম। নকুল দু'জনের জন্য প্রচুর প্রাতরাশ করেছে, একলা দেবাশিসের জন্য এত করে না।

দেবাশিস দীপার দিকে চোখ তুলে সহজ গলায় বলল–'তুমি চা ঢালবে?'

দীপাদের বাড়িতে সাবেক রেওয়াজ, পেয়ালায় চা ঢালা হয়ে সকলের কাছে যায়; প্রাতরাশ খাওয়ার কোনো বিধিবদ্ধ রীতি নেই। সে একটু ইতস্তত করল। তাই দেখে দেবাশিস বলল–'আচ্ছা, আমিই চা ঢালছি।'

দু'টি পেয়ালায় চা ঢেলে সে একটি পেয়ালা দীপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে, চা খেতে খেতে কথা হবে।'

দীপা সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারে বসল। তার সঙ্কোচ মনের জড়ত্ব নয়, অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্কোচ। তার জীবনে অভাবনীয় ওলট-পালট আরম্ভ হয়েছে।

দেবাশিস নিজের চায়ে একটি ছোট চুমুক দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখল, বলল–'তোমার দাদা বিজয়মাধব আজ ভোর হতে না হতে এসেছিল।'

দীপা চকিত চোখ তুলে আবার চোখ নত করল। দেবাশিস এক টুকরো টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল–'তার কথা শুনে মনে হল তোমার গুপ্তকথা বাড়ির সবাই জানে। বাইরের কেউ জানে নাকি?'

দীপা মাথায় একটা ঝাঁকনি দিয়ে বলল-'না-না–।' আর কোনো কথা তার শুকনো গলা দিয়ে বেরুল না।

দেবাশিস বলল–'তা সে যাই হোক, সব কথা বিবেচনা করা দরকার। একটা ব্যাপার ঘটেছে, আমার জীবনে হঠাৎ একটা বেয়াড়া সমস্যা এসে হাজির হয়েছে। যথাসাধ্য কেলেঙ্কারি বাঁচিয়ে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

দীপা ঘাড় নাড়ল, অস্ফুট স্বরে বলল–'পারছি।' সে কিন্তু দেবাশিসের ধরনধারন কিছুই বুঝতে পারছে না। এরকম অবস্থায় মানুষ কি এমনিভাবে কথা বলে?

দেবাশিস টেস্টে কামড় দিয়ে বলল–'তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

দীপা তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিল, কিন্তু হাতের পেয়ালা হাতেই রইল, ঠোঁট পর্যন্ত উঠল না।

দেবাশিস শান্তভাবে বলল—'সমস্যার সোজাসুজি নিষ্পত্তি আছে-ডিভোর্স।'

দীপার হাতের পেয়ালা কেঁপে উঠল। আর একটু হলেই পড়ে যেত। সে সামলে নিয়ে রুদ্ধস্বরে বলল—'না।'

দেবাশিস ভুরু তুলে বলল–'না কেন? তোমার বাড়ির লোক ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে না দিয়ে অন্যায় করেছেন, সে অন্যায় সংশোধন করা উচিত।'

দীপা নত চোখে বলল—'আমার দাদু-তিনি তাহলে বাঁচবেন না।'

দেবাশিস কিছুক্ষণ কথা কইল না, কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবে দীপার পানে চেয়ে রইল। তারপর নিজের ঈষদুষ্ণ পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে আবার রেখে দিল।

উদয়মাধবকে দেবাশিস দেখেছে, বৃদ্ধের চারিত্রিক প্রবলতা অনুভব করেছে, নাতনী ডিভোর্স-কোর্টে গিয়েছে শুনলে তিনি হয়তো আত্মহত্যা করবেন না, কিন্তু নাতনীকে খুন করতে পারেন।

'ডিভোর্স যদি সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—তুমি বাপের বাড়ি ফিরে যাও, সেখানে যেমন ছিলে তেমনি থাকে।'

'না, ওরা আবার আমায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে। মাঝ থেকে জানাজানি হবে।'

'তাহলে তৃতীয় পন্থা হচ্ছে এখানেই থাকা। আলাদাই থাকবে, আমি তোমার কাছে যাব না। কিন্তু আমারও তো লোকলজ্জা আছে। বাইরের লোকের কাছে ভণ্ডামি করতে হবে। তুমি পারবে?'

দীপা ঘাড় নেড়ে জানাল, সে পারবে।

দেবাশিস বলল–'বাড়ির চাকরীও বাইরের লোক। তার সামনেও ধোঁকার টাটি খাড়া রাখতে হবে।'

দীপা আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

দেবাশিস নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল–'বেশ। কিন্তু এভাবে কত দিন চলবে?'

দীপা চুপ করে রইল, এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই জানে না। দেবাশিস আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা খুবই অল্প; কিন্তু তার মনে হল, এরা বড় স্বার্থপর, নিজের স্বার্থই বোঝে, আর কারুর কথা ভাবে না।

কাল দেবাশিস ভেবেছিল, এখন দু'তিন দিন সে ফ্যাক্টরিতে যাবে না, সারা দিন বাড়িতে থেকে বউয়ের সঙ্গে ভাব করবে। কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। সে খানিকক্ষণ বিমনাভাবে ঘুরে বেড়ালো, কাল রাত্রে যে বিছানায় শুয়েছিল সেটা ঝেড়েকুড়ে ঠিক করে রাখল, নকুল না। সন্দেহ করে যে, তারা আলাদা শুয়েছে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে বলল–'নকুল, আমার খাবার তৈরি কর, আমি ন'টার সময় ফ্যাক্টরি যাব।'

স্নান করতে গিয়ে দেবাশিসের একটা কথা মনে এল। সে দেখল, দীপা তখনো বসবার ঘরে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, সে তার কাছে গিয়ে বলল–'নকুলের চোখে যদি ধুলো দিতে হয় তাহলে তোমার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে আমাকে স্নান করতে হবে। অন্য বাথরুমে

আমার ভিজে কাপড় দেখলে নকুলের মনে সন্দেহ হবে। আমি তোমার বাথরুমে স্নান করতে পারি?

দীপার মনে হল দেবাশিস তাকে ব্যঙ্গ করছে। সে চোখ তুলে চাইল, কিন্তু দেবাশিসের মুখে ব্যঙ্গবিদ্রূপের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না। সে তখন একটু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

দেবাশিস স্নানাহার করে ন'টার সময় কাজে চলে গেল।

অতঃপর সংসারের সব ভার পড়ল নকুলের ওপর। নতুন বউকে বাড়ির কাজকর্ম শেখাতে হবে, বউয়ের খাওয়া-দাওয়ার ওপর নজর রাখতে হবে। বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই; সাময়িকভাবে নকুল হয়ে উঠল বাড়ির গিন্নী।

দুপুরবেলা দীপকে ভাত খাইয়ে নকুল ওপরে পাঠিয়ে দিল, বলল–'যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।'

কিন্তু দীপার দিনের বেলা ঘুমোনো অভ্যেস নেই। সে ঘুরে ঘুরে ওপরতলাটা দেখতে লাগল।...এই ঘরে কাল রাত্রে দেবাশিস। শুয়েছিল...নকুল যেন জানতে না পারে, সে ওপরে আসবার আগেই রোজ বিছানা ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে.বাড়ির পাশের ব্যালকনি থেকে বাগানটা দেখা যায়। বাগানের ছিরি নেই, যেন কত কাল কেউ বাগানের

দিকে তাকায়নি। দেবাশিসের বাগানের শখ নেই। দীপার খুব বাগানের শখ আছে। সে বাপের বাড়ির খোলা ছাদে টবের বাগান করেছিল।

ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে সে বসবার ঘরে এল। রেডিওগ্রামের ওপর নজর পড়ল। দীপা রেডিও শুনতে ভালবাসে. বাপের বাড়িতে তার একটি ট্রানজিস্টার ছিল, সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান শুনত, ফুটবলের কমেন্টারি শুনাত, নাট্যাভিনয় শুনত। ট্রানজিস্টারটা আনা হয়নি। তার অনেক নিজস্ব জিনিস বাপের বাড়িতে পড়ে আছে।

দীপা রেডিওগ্রামের কপাট সরিয়ে কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে করতে গানের সুর বেজে উঠল। দুপুরবেলার শান্ত ত্বরাহীন প্রোগ্রাম। সে রেডিওর পাশে একটা গদি-মোড়া আরাম-চেয়ারে বসে শুনতে লাগল।

কাল রাত্রে দীপা অল্পই ঘুমিয়েছে, যেটুকু ঘুমিয়েছে তাও যেন আড়ষ্ট হয়ে। এখন রেডিওর মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে তার চোখ বুজে এল।

হঠাৎ তার চমক ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। সে চোখ মেলে দেখল, ঘরের কোণে ছোট টেবিলের ওপর টেলিফোন বাজছে। দীপা রেডিও বন্ধ করে দিল। নিশ্চয় দেবাশিসের টেলিফোন। একটু ইতস্তত করে সে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল।

'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ এল—'দীপা, আমার গলা চিনতে পারছ?'

দীপার বুক ধড়ফড় করে উঠল, সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল–'পারছি।'

'ঘরে কেউ আছে?'

না, আমি একা।'

'বেশ। তোমার স্বামীকে বলেছ?'

'বলেছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু না।'

'রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করেনি?

'না।'

'তুমি একলা শুয়েছিলে?'

‘হ্যাঁ।’

‘বেশ। এইভাবে চালিয়ে যাও।’

‘কত দিন?

‘একটু সময় লাগবে। তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। শপথ মনে আছে তো?’

‘হ্যাঁ।‘

‘শপথ করেছ, আমার নাম কাউকে বলবে না। মা কালীর নামে শপথ করেছ, মনে আছে?’

‘আছে।’

‘তোমার স্বামী হয়তো নাম জানবার জন্যে পীড়ন করতে পারে।’

‘নাম জানতে চাননি। চাইলেও আমি বলব না।’

‘বেশ। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে ফোন করব। দুপুরবেলা তোমার স্বামী যখন বাড়িতে থাকবে না। তখন ফোন করব।’

‘আচ্ছা।’

সে ফোন রেখে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল। মনে হল তার শরীরের সমস্ত জোর ফুরিয়ে গেছে।

০৪. দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল

বিকেল পাঁচটার সময় দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এল। নকুল দোর খুলে দিল। দীপা ওপর থেকে ঘন্টির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, সে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

দেবাশিস ওপরে উঠে এসে দেখল, দীপা নীরব রেডিওগ্রামের সামনে বসে আছে। সে ঢুকতেই দীপা চকিতে একবার তার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল। দেবাশিস দ্বিধামন্থর পায়ে তার সামনে এল। কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা কতক্ষণ চলে! শেষে দেবাশিস বলল—’নকুল তোমার দেখাশুনো করেছিল তো?’

দীপা ঘাড় নেড়ে বলল–’হ্যাঁ।’

দেবাশিস প্রশ্ন করল–’চা খেয়েছ?’

দীপা মাথা নাড়ল–’না।’

অতঃপর আর কি বলা যেতে পারে, দেবাশিস ভেবে পেল না। ওদিকে দীপা প্রাণপণে চেষ্টা করছে সহজভাবে যা হোক একটা কিছু বলতে। কিন্তু কী বলবে? বক্তব্য কী আছে? শেষ পর্যন্ত একটা কথা মনে এল, সে ঘাড় তুলে বলল—’আপনি দুপুরবেলা কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেন?’

দেবাশিস বলল—'আমার ফ্যাক্টরিতে খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে সকলেই দুপুরবেলা ক্যানটিনে খায়। আমিও খাই।'

দীপা শুধু বলল–'ও।'

দেবাশিস বলল–'আচ্ছা, আমি কাপড়-চোপড় বদলে নিই, তারপর নীচে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।'

সংশয়স্খলিত স্বরে দীপা বলল–'আচ্ছা।'

দেবাশিস দীপার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল–'আমি তাহলে তোমার বাথরুমেই ব্যবহার করছি।'

দোর পর্যন্ত গিয়ে দেবাশিস থমকে দাঁড়াল, তারপর আস্তে আস্তে দীপার সামনে ফিরে এসে গলা খাটো করে বলল—'একটা কথা। তুমি আমাকে 'আপনি বললে ভাল শোনায় না। অবশ্য আড়ালে তা বলতে পোর, কিন্তু নকুল কিংবা অন্য কারুর সামনে 'তুমি বলাই স্বাভাবিক। নইলে ওদের খটকা লাগতে পারে।'

দীপা মুখ নীচু করে নীরব রইল।

দেবাশিস প্রশ্ন করল–'কি বলো?'

দীপা অনিচ্ছাভিরা ক্ষীণ স্বরে বলল–'আচ্ছা।'

দেবাশিস বাথরুমে চলে গেল। দীপা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, প্রকাশ্যে 'তুমি বলা এবং আড়ালে 'আপনি বলা কি খুব সহজ কাজ? রঙ্গালয়ের নটনটীরা বোধহয় পারে। তার মনে হল সে আস্তে আস্তে অতলস্পর্শ চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পরে দেবাশিস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল, বলল–'চল, নীচে যাই।'

দেবাশিসের পিছু পিছু দীপা নীচে নেমে গেল, দু'জনে টেবিলের দু'প্রান্তে বসল। নকুল তাদের সামনে রেকাবি-ভরা লুচি তরকারি রাখল। দেবাশিস খেতে আরম্ভ করল। কিন্তু দীপা হাত গুটিয়ে বসে রইল।

নকুল জিজ্ঞেস করল-'দাদাবাবু, ডিম ভেজে দেব?'

দেবাশিস দীপার পানে চাইল। দীপা একটু মাথা নাড়ল; বাপের বাড়িতে তার ডিম খাওয়া বারণ ছিল। আইবুড়ো মেয়েদের ডিম খেতে নেই।

দেবাশিস বলল–'থাক, দরকার নেই।'

চায়ের পেয়ালা টেবিলে রাখতে এসে নকুল বলল–’ও কি বউদি, তুমি খাচ্ছ না?’

দীপা মাথা হেঁট করল, তারপর কাতর দৃষ্টিতে দেবাশিসের পানে তাকাল। দেবাশিস বুঝতে পারল দীপার সংকোচের কারণ কি। সে একটু হেসে বলল—’নকুল, ওর বোধহয় পুরুষের সামনে খাওয়া অভ্যোস নেই।’

দেবাশিস তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর নকুল দীপার কাছে এসে বলল–’বউদি, এ সংসারে মেয়ে-পুরুষ সবাই একসঙ্গে খায়, কতর্বাবুর আমল থেকে এই রেওয়াজ দেখে আসছি। তুমি যখন এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছি তখন তোমাকেও তোক এ বাড়ির রেওয়াজ মেনে চলতে হবে। ভাবনা নেই, আস্তে আস্তে অভ্যোস হয়ে যাবে। নাও, খেতে আরম্ভ কর। তোমার বাপের বাড়িতে কি ডিমের চলন নেই?

দীপা বলল—’পুরুষেরা হাঁসের ডিম খান। মুরগির ডিমের চলন নেই।‘

নকুল বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল-’হাঁসের ডিমও যা মুরগির ডিমও তাই, সব ডিমই সমান।’

দীপা নকুলের তদারকিতে চা-জলখাবার খেয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখল, দেবাশিস সিঁড়ির হাতলের ওপর কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দীপকে দেখে সে বলল–’বেড়াতে যাবে? সারা দিন তো বাড়িতে বন্ধ আছে, চল না মোটরে খানিক বেড়িয়ে আসবে।’

অভিনয় চলছে চলুক, কিন্তু কোথাও একটা সীমারেখা টানা দরকার। দীপা সোজা দৃষ্টিতে দেবাশিসের পানে চেয়ে দৃঢ় স্বরে বলল—’না।’

দেবাশিসের মুখ দেখে মনে হল না যে সে মনঃক্ষুন্ন হয়েছে, সে সহজভাবে বলল—’আচ্ছা, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি। বেশিদূর নয়, নৃপতিদার আড্ডা পর্যন্ত।’

সে বেরিয়ে পড়ল। অর্ধেক পথ গিয়েছে, দেখল কপিল বোস পায়ে হেঁটে তার দিকেই আসছে। কপিলের একটি ছোট মোটর আছে, বেশির ভাগ তাতেই সে ঘুরে বেড়ায়। মুখোমুখি হলে দেবাশিস বলল–’এদিকে কোথায় চলেছেন?’

কপিল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল—’আপনার দিকেই যাচ্ছিলাম।’

মনে মনে বিস্মিত হলেও দেবাশিস মুখে বলল–’আমার দিকে? তা—চলুন, ফেরা যাক।’

কপিল তাড়াতাড়ি বলল—’না না, তার দরকার নেই। আপনি আড্ডায় যাচ্ছেন তো? চলুন, আমারও শেষ গন্তব্যস্থান সেখানেই। আপনার কাছে যাচ্ছিলাম একটা জিনিসের খোঁজে।’

দু’জনে নৃপতির বাড়ির দিকে চলল। দেবাশিস জিজ্ঞেস করল–’কিসের খোঁজে?’

কপিল দ্বিধাভরে বলল–'আমার সিগারেট-কেসটা আজ সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। যতদূর মনে পড়ে কাল বিকেল পর্যন্ত ছিল; তারপর আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সিগারেটই খেয়েছি, আমার পকেটে সিগারেট-কেস আছে কিনা খেয়াল করিনি। আজ সকালবেলা দেখি নেই। বাড়িতে খুঁজলাম, পাওয়া গেল না। তা ভাবলাম, খোঁজ নিয়ে আসি আপনার বাড়িতেই পকেট থেকে পড়ে গেছে কিনা।'

দেবাশিস বলল—'আমার বাড়িতে যদি পড়ে থাকে এবং কেউ তুলে না নিয়ে থাকে তাহলে নকুল নিশ্চয় সরিয়ে রেখেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করব। কিসের সিগারেট-কেস–সোনার?'

কপিল তাড়াতাড়ি বলল-'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ভাববেন না, আমি প্রায়ই জিনিস হারিয়ে ফেলি, তবে বেশির ভাগ সময়েই পাওয়া যায়। হয়তো বাড়িতেই আছে, কিংবা নৃপতিদার আড্ডায়।'

নৃপতির আডাঘরে তখন আলো জ্বলছে; ঘরে কেবল নৃপতি আর প্রবাল বসে গল্প করছে। এরা ঘরে ঢুকলে নৃপতি সমাদ্দারের সুরে বলে উঠল—'আরে, এস এস।'

দু'জনে নৃপতির কাছে বসল। নৃপতি দেবাশিসকে নিবিষ্ট চোখে দেখতে দেখতে চাপা কৌতুকের সুরে বলল–'আমি তো ভেবেছিলাম, এখন কিছু দিন তুমি বাড়ি থেকে বেরুবেই না। যাহোক, দাম্পত্য-জীবন কেমন লাগছে?'

প্রশ্নের জন্যে দেবাশিস তৈরি ছিল না, একটু দম নিয়ে মুখে সলজ্জ হাসি এনে বলল–’মন্দ কি, ভালই লাগছে।’

প্রবালের গলার মধ্যে হাসির মত একটা শব্দ হল, সে বলল–’প্রথম প্রথম ভালই লাগে। তারপর–সে উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসিল, টুং টাং শব্দে একটা বিষাদের সুর বাজতে লাগল।

কপিল ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল, তারপর বিস্বাদসূচক মুখভঙ্গী করে দেবাশিসকে বলল–’এক জাতের লোক আছে তারা শুধু চাঁদের কলঙ্কই দেখে, চাঁদ দেখতে পায় না। নৃপতিদা, একটা সিগারেট দিন, আমার সিগারেট-কেসটা হারিয়ে ফেলেছি।’

কপিল সিগারেট ধরিয়েছে এমন সময় চিত্রনক্ষত্র সুজন মিত্র প্রবেশ করল। বোধহয় সোজা ফিল্ম স্টুডিও থেকে আসছে, পরনে করতুরয়ের লম্বা প্যান্ট এবং টকটকে লাল রঙের সিল্কের শার্ট। দেবাশিসকে দেখে চোখ বড় করে কৌতুকের ভঙ্গীতে হাসল, তারপর বলল–’নৃপতিদা, আজ কাগজে খবর দেখেছেন?’

সকলেই উৎসুক চোখে তার পানে চাইল, প্রবালের পিয়ানো বন্ধ হল। নৃপতি বলল–’কি খবর? কাগজ। অবশ্য পড়েছি, কিন্তু গুরুতর কোনো খবর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।’

সুজন পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল—'গুরুতর খবর না হতে পারে। কিন্তু ঘরোয়া খবর। আমাদের পাড়ার খবর। খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটি খবর। গোল পার্কের কাছে কাল ভোরবেলা একজন ভিখিরি মারা গেছে।' এই বলে সুজন নাটকীয় ভঙ্গীতে চুপ করল। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

সুজন তখন আবার আরম্ভ করল–'ভাবছেন, একটা ভিখিরির মৃত্যু এমন কী চাঞ্চল্যকর খবর। কিন্তু ভিখিরির মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কোনো অজ্ঞাত ঘাতক তাকে খুন করেছে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর খবর, অজ্ঞাত আততায়ী ভিখিরির পিঠের দিক থেকে তার বুকের মধ্যে একটা শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে বধ করেছে।'

সুজনের বক্তৃতার মাঝখানে প্রবালও পিয়ানো থেকে উঠে কাছে এসে বসেছিল। শ্রোতারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে নৃপতি বলল–'ছোট খবর বলেই বোধহয় চোখে পড়েনি। তোমরা কেউ পড়েছ?'

কেউ পড়েনি। দেবাশিস এবং প্রবাল খবরের কাগজ পড়ে না। নতুন খবরের প্রতি তাদের আসক্তি নেই। কপিল কেবল খেলাধুলোর পাতাটা পড়ে।

প্রবাল বলল–'শজারুর কাঁটা কি মানুষের শরীরে বিঁধিয়ে দেওয়া যায়-ভেঙে যাবে না?'

নৃপতি পণ্ডিত ব্যক্তি, সে বলল—'না, ভাঙবে না। নরম কাঁটা হলে দুমড়ে যেতে পারে। কিন্তু ভাঙবে না। শক্ত কাঁটা লোহার শলার মত সটান মাংসের মধ্যে ঢুকে যাবে।'

প্রবাল জিজ্ঞেস করল–'শজারুর কাঁটা কোথায় পাওয়া যায়? বাজারে বিক্রি হয় নাকি?'

নৃপতি বলল—সব জায়গায় পাওয়া যায় না। শুনেছি নিউ মার্কেটে দুএকটা দোকানে পাওয়া যায়। তাছাড়া বেদেরা গড়ের মাঠে বিক্রি করতে আসে।'

দেবাশিস বলল–'কিন্তু ছোরাজুরি থাকতে শজারুর কাঁটা দিয়ে মানুষ খুন করবার মানে কি?'

কেউ সদুত্তর দিতে পারল না। কপিল নতুন প্রশ্ন করল—'কিন্তু ভিখিরিকে কে খুন করবে? কেন খুন করবে?'

নৃপতি একটু ভেবে বলল–'ভিখিরিদের মধ্যেও কৃপণ ও সঞ্চয়ী লোক থাকে। এমন শোনা গেছে, ভিখিরি মারা যাবার পর তার কাঁথা-কানির ভেতর থেকে দু'শো চারশো টাকা বেরিয়েছে। এই লোকটিও হয়তো সঞ্চয়ী ছিল, তার টাকার লোভে কেউ তাকে খুন করেছে।'

কপিল বলল–'আমার মনে হয় এ একটা উন্মাদ পাগলের কাজ। নইলে শজারুর কাঁটার কোনো মানে হয় না।'

সুজন বলল—'তা বটে, প্রকৃতিস্থ মানুষ শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করবে। কেন? প্রবাল, তোমার কি মনে হয়?'

প্রবাল অবহেলাভরে বলল—'যে-ই খুন করুক সে সাধু ব্যক্তি, ভিখিরি মেরে সমাজের উপকার করেছে। যারা কাজ করে না তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।' সে উঠে গিয়ে আবার পিয়ানোর সামনে বসিল।

তারপর খড়্গা বাহাদুর এল। তার আজ মাঠে খেলা ছিল; সে খেলার কথা তুলল, আলোচনার প্রসঙ্গ বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হল। কিছুক্ষণ পরে কফি এল। কফি খেয়ে আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর দেবাশিস বাড়ি ফিরল।

দেবাশিসের জীবনযাত্রা বিয়ের আগে যেমন ছিল বিয়ের পরেও প্রায় তেমনি রয়ে গেল। বাড়িতে একজন লোক বেড়েছে এই যা। কেবল নকুল এবং বাইরের অন্যান্যদের সামনে ভণ্ডামি করতে হয়। দেবাশিসের ভাল লাগে না!

আড়ালে দীপার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। ঘনিষ্ঠত না করে যতটা সহজভাবে একসঙ্গে বাস করা যায় দু'জনে সেই চেষ্টা করছে। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। দীপার মনের নিভৃত আতঙ্ক তার চোখের চাউনিতে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেবাশিসের মন অশান্ত; সে জানে দীপা অন্যকে ভালবাসে, তবু দীপা তার মনকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করছে। বিজয় বলেছিল, দীপা ছেলেমানুষ, দুচার দিন স্বামীর ঘর করলেই আগের কথা

ভুলে যাবে। কিন্তু দীপার ভাবভঙ্গী দেখে তা মনে হয় না। দীপা আর যাই হোক, তার মন চঞ্চল নয়।

এইরকম শঙ্কা-দ্বিধার মধ্য দিয়ে কিছুদিন কেটে যায়। একদিন বিকেলবেলা ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দেবাশিস দীপকে বলল–'একটা কথা আছে। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের ইচ্ছে, তুমি একদিন ফ্যাক্টরিতে যাও, ওরা তোমাকে পার্টি দিতে চায়। যাবে?'

দীপার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, এ আবার কি নতুন ঝঞ্ঝাট? সে একটু চুপ করে থেকে বলল-না গেলেই কি নয়?'

দেবাশিস বলল—'তুমি যদি না যেতে চাও আমি জোর করতে পারি না। তবে না গেলে খারাপ দেখায়।'

শুকনো মুখে দীপা বলল–'তাহলে যাব।'

দু'তিন দিন পরে দেবাশিস একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরল, তারপর কোট প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে দীপাকে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে ফিরে গেল।

প্রজাপতি প্রসাধন ফ্যাক্টরির কারখানাটি ব্যারাকের মত লম্বা্‌্‌, তাতে অসংখ্য ঘর, দু' পাশে চওড়া বারান্দা। বাড়ির চার ধারে অনেকখানি খোলা জমিও আছে। কেমিস্ট এবং

কর্মী মিলিয়ে আন্দাজ ষাটজন লোক এখানে কাজ করে। ফ্যাক্টরি হিসাবে বড় প্রতিষ্ঠান বলা যায় না; কিন্তু এখান থেকে যে শিল্পদ্রব্য তৈরি হয়ে বেরোয় তার চাহিদা সর্বত্র।

আজ ফ্যাক্টরির পুরোভূমিতে একটি ছোট মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। দেবাশিসের মোটর মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ফ্যাক্টরির প্রবীণ কেমিস্ট ডক্টর রামপ্রসাদ দত্ত এসে দীপাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন। ডক্টর দত্তর পিছনে আরো কয়েকজন কর্মী ছিল, সকলে হাসিমুখে দীপাকে অভ্যর্থনা করল।

ডক্টর দত্ত দীপাকে বললেন–'চল, আগে তোমাকে তোমার ফ্যাক্টরি দেখাই।'

ডক্টর দত্ত বয়সে দীপার পিতৃতুল্য, তাঁর সস্নেহ ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে দীপার মনের আড়ষ্টতা অনেকটা কেটে গেল। দেবাশিস তাদের সঙ্গে গেল না; সে জানতো, সে সঙ্গে না থাকলে দীপা বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

ফ্যাক্টরির কাজের বেলা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু কয়েকটা ঘরে কয়েকজন লোক তখনো কাজ করছে। কোথাও সারি সারি জালার মত কাচের পাত্রে কেশতৈল রাখা রয়েছে, কোনো ঘরে স্নো ক্রিম, কোনো ঘরে ল্যাভেন্ডার অডিকলোন প্রভৃতি নানা জাতের তরল গন্ধদ্রব্য। সব মিশিয়ে একটি চমৎকার সুগন্ধে বাড়ি ম-ম করছে।

ডক্টর দত্ত ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতসারেই দীপার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এটা কি, ওটা কেমন করে তৈরি হয়, ক্রিম স্নো ইত্যাদিতে কি কি

উপকরণ লাগে এইসব প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে সে যেন একটা নতুন রাজ্যে প্রবেশ করল। নতুন তথ্য আবিষ্কারের একটা উত্তেজনা আছে, কৌতূহলী মন সহজেই মেতে ওঠে।

ফ্যাক্টরি পরিদর্শন শেষ করে ডক্টর দত্ত দীপাকে মণ্ডপে নিয়ে গেলেন। মণ্ডপের একপাশে অনুচ্চ মঞ্চ, তার ওপর কয়েকটি চেয়ার; মঞ্চের সামনে দর্শকদের চেয়ারের সারি। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে সকলেই মণ্ডপে উপস্থিত। ডক্টর দত্ত দীপাকে মঞ্চের ওপর একটি চেয়ারে বসালেন, দেবাশিস তার পাশে বসিল। ফাংশন আরম্ভ হল।

ফ্যাক্টরির কর্মীরা শুধু কাজই করে না, তাদের মধ্যে শিল্পী রসিক গুণিজনও আছে। একটি কোট-প্যান্ট পরা ছোকরা প্রেক্ষাভূমি থেকে উঠে এসে রবীন্দ্রনাথের গান ধরল–তোমরা সবাই ভাল, আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলো। ছোকরার গলা ভাল; গান শুনতে শুনতে শ্রোতাদের দন্ত বিকশিত হয়ে রইল। দীপার মুখেও একটি অরুণাভ হাসি আনাগোনা করতে লাগল। সে একবার আড়চোখে দেবাশিসের পানে তাকাল; দেখল, তার ঠোঁটে লোক-দেখানো নকল হাসি। দীপা এখন দেবাশিসের হাসি দেখে বুঝতে পারে আসল হাসি কি নকল হাসি। তার মন হোঁচটি খেয়ে শক্ত হয়ে বসল।

গানের পালা শেষ হলে আর একটি যুবক এসে গম্ভীর মুখে একটি হাসির গল্প শোনাল। সকলে খুব খানিকটা হাসল। তারপর ডক্টর দত্ত উঠে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন। চা কেক দিয়ে সভা শেষ হল।

দেবাশিস দীপাকে নিয়ে নিজের মোটরের কাছে এসে দেখল, মোটরের পিছনের সীট একরাশ গোলাপফুল এবং আরো অনেক উপহারদ্রব্যে ভরা। দেবাশিস স্নিগ্ধকণ্ঠে সকলকে ধন্যবাদ দিল, তারপর দীপকে পাশে বসিয়ে মোটর চালিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যে তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতে দেবাশিস বলল—'কেমন লাগল?'

পাশের আলো-আঁধারি থেকে দীপা বলল—'ভাল।'

গাড়ির দু'পাশের ফুটপাথ দিয়ে স্রোতের মত লোক চলেছে, তারা যেন অন্য জগতের মানুষ। গাড়ি চলতে চলতে কখনো চৌমাথার সামনে থামছে, আবার চলছে; এদিক ওদিক মোড় ঘুরে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।

'ডক্টর দত্তকে কেমন মনে হল?'

এবার দীপার মনে একটু আলো ফুটল–'খুব ভালো লোক, এত চমৎকার কথা বলেন। উনি কি অনেক দিন। এখানে, মানে ফ্যাক্টরিতে আছেন?'

দেবাশিস বলল–'বাবা যখন ফ্যাক্টরি পত্তন করেন তখন থেকে উনি আছেন। আমি ফ্যাক্টরির মালিক বটে, কিন্তু উনিই কর্তা।'

গাড়ির অভ্যন্তর গোলাপের গন্ধে পূর্ণ হয়ে আছে। দীপা দীর্ঘ আঘ্রাণ নিয়ে বলল—’ফ্যাক্টরির অন্য সব লোকেরাও ভাল।’

দেবাশিস মনে মনে ভাবল, ফ্যাক্টরির সবাই ভাল, কেবল মালিক ছাড়া। মুখে বলল—‘ওরা সবাই আমাকে ভালবাসে।’ একটু থেমে বলল–’ফ্যাক্টরি থেকে বার্ষিক যে লাভ হয় তার থেকে আমি নিজের জন্যে বারো হাজারা টাকা রেখে বাকি সব টাকা কর্মীদের মধ্যে মাইনের অনুপাতে ভাগ করে দিই।’

‘ও—’ দীপার মনে একটা কৌতূহল উঁকি মারল, সে একবার একটু দ্বিধা করে শেষে প্রশ্ন করল–’ফ্যাক্টরি থেকে কত লাভ হয়?’

দেবাশিস উৎসুকভাবে একবার দীপার পানে চাইল, তারপর বলল–’খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ইনকাম ট্যাক্স শোধ করে এ বছর আন্দাজ দেড় লাখ টাকা বেঁচেছে। আশা হচ্ছে, আসছে বছর আরো বেশি লাভ হবে।’

আর কোনো কথা হবার আগেই মোটর বাড়ির ফটকে প্রবেশ করল। বাড়ির সদরে মোটর দাঁড় করিয়ে দেবাশিস বলল-‘গোলাপফুলগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।’

দীপা বলল–’আমি করছি।’

নকুল এসে দাঁড়িয়েছিল, দীপা তাকে প্রশ্ন করল–'নকুল, বাড়িতে ফুলদানি আছে?'

নকুল বলল–'আছে। বইকি বউদি, ওপরের বসবার ঘরে দেয়াল-আলমারিতে আছে। চাবি তো তোমারই কাছে।'

'আচ্ছা। আমি ওপরে যাচ্ছি, তুমি গাড়ি থেকে ফুল আর যা যা আছে নিয়ে এস।' দীপা ওপরে চলে গেল।

ওপরের বসবার ঘরে কাবার্ডে অনেক শৌখিন বাসন-কোসন ছিল, তার মধ্যে কয়েকটা রূপের ফুলদানি। কিন্তু বহুকাল অব্যবহারে রূপোর গায়ে কলঙ্ক ধরেছে। দীপা ফুলদানিগুলোকে বের করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর নকুল এক বোঝা গোলাপ নিয়ে উপস্থিত হলে তাকে প্রশ্ন করল-নকুল, ব্রাসো আছে?'

নকুল বলল–'বাসন পরিষ্কার করার মলম? না বউদি, ছিল, শেষ হয়ে গেছে। কে আর রূপের বাসন মাজাঘষা করছে! আমি তেঁতুল দিয়েই কাজ চালিয়ে নিই।'

দীপা বলল—'তেঁতুল হলেও চলবে। এখন চল, ফুলগুলোকে বাথরুমের টবে রেখে ফুলদানি পরিষ্কার করতে হবে।'

দীপার শয়নঘরের সংলগ্ন বাথরুমে জলভরা টবে লম্বা ডাঁটিসুদ্ধ গোলাপ ফুলগুলোকে আপাতত রেখে দীপা তেঁতুল দিয়ে ফুলদানি সাফ করতে বসল। এতদিন পরে সে একটা কাজ পেয়েছে যাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলে থাকা যায়।

দেবাশিস একবার নিঃশব্দে ওপরে এসে দেখল, দীপা ভারি ব্যস্ত। আচলটা গাছ-কোমের করে। জড়িয়েছে, মাথার চুল একটু এলোমেলো হয়েছে; ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। দেবাশিস দোরের কাছে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চোখে দেখল, কিন্তু দীপা তাকে লক্ষ্যই করল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেবাশিস আস্তে আস্তে নীচে নামল, তারপর নৃপতির বাড়িতে চলে গেল।

কিন্তু আজ আর তার আড্ডায় মন বসল না! ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। ওপরের বসবার ঘরে দীপা রেডিও চালিয়ে বসে ছিল, দেবাশিসকে দেখে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে রেডিও নিবিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল–'ফুলগুলোকে ফুলদানিতে সাজিয়ে ঘরে ঘরে রেখেছি। দেখবে?'

দেবাশিসের মনের ভিতর দিয়ে বিস্ময়ানন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল। দীপা এতদিন তাকে প্রকাশ্যে 'তুমি এবং জনাস্তিকে 'আপনি বলেছে, আজ হঠাৎ নিজের অজান্তে জনান্তিকেও 'তুমি বলে ফেলেছে।

দেবাশিস মুচকি হেসে বলল–'চল, দেখি।'

দীপা তার হাসি লক্ষ্য করল; হাসিটা যেন গোপন অর্থবহ। সে কিছু বুঝতে পারল না, বলল—'এস।'

নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দীপা দেবাশিসের মুখের পানে চাইল; দেবাশিস দেখল, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ঝকঝকে রূপের ফুলদানিতে দীর্ঘবৃন্ত একগুচ্ছ গোলাপ শোভা পাচ্ছে। লাল, গোলাপী এবং সাদা, তিন রঙের গোলাপ, তার সঙ্গে মেডেন হেয়ার ফানের জালিদার পাতা।

ফুলদানিতে ফুল সাজানোর কলাকৌশল আছে, যেমন-তেমন করে সাজালেই হয় না। দেবাশিস খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে উঠল–'বা, ভারি চমৎকার সাজিয়েছ! মনে হচ্ছে যেন ফুলের ফোয়ারা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে বসবার ঘরে এসে দেবাশিসের নজর পড়ল রেডিওগ্রামের ওপরে একটা ফুলদানিতে গোলাপ সাজানো রয়েছে। এর সাজ অন্য রকম; চরকি ফুলঝুরির মত ফুলগুলি গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে দেবাশিস বলল–'এটাও ভারি সুন্দর। আগে চোখে পড়েনি।'

এই সময় নকুল নীচে থেকে হাঁক দিল—'বউদিদি, তোমরা এস; ভাত বেড়েছি।'

দু'জনে নীচে নেমে গেল। রান্নাঘরের টেবিলেও গোলাপগুচ্ছ। দেবাশিস দীপার পানে প্রশংসাপূর্ণ চোখে চেয়ে একটু হাসল।

সে-রাত্রে নিজের ঘরে শুতে গিয়ে দেবাশিস দেখল, তার ড্রেসিং টেবিলের ওপরেও আলাপের ফেয়ার। দীপা তার ঘরে ফুল রাখতে ভোলেনি। দেবাশিসের মন মাধুর্যপূর্ণ হয়ে দীপা নিজের ঘরে গিয়ে নৈশদীপ জ্বেলে শুয়েছিল। কিন্তু ঘুম সহজে এল না। মনের মধ্যে একটি আলোর চারপাশে বাদলা পোকার মত অনেকগুলো ছোট ছোট চিন্তার টুকরো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোটি স্নিগ্ধ তৃপ্তির আলো। আজকের দিনটা যেন গোলাপ-জলের ছড়া দিয়ে এসেছিল...ফ্যাক্টরিতে অনুষ্ঠান.ডক্টর দত্ত্ব্ , সভামণ্ডপে গান...তোমরা সবাই ভাল...ফ্যাক্টরির সবাই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তাকে খুশি করতে...রাশি রাশি গোলাপফুল...ঘরে সাজিয়ে রাখতে কী ভালই লাগে...দেবাশিসের ভাল লেগেছে.সে অমন মুখ টিপে হাসল কেন?...যেন হাসির আড়ালে কিছু মানে ছিল-ওঃ!

শুয়ে শুয়ে দীপার মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সে মনের ভুলে দেবাশিসকে আড়ালে ‘তুমি বলে ফেলেছিল, তখন বুঝতে পারেনি। দেবাশিস তাই শুনে হেসেছিল।

দীপা বিছানা থেকে উঠে খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে রাস্তা চলে গেছে; রাস্তার ওপারের তিন চারটে বাড়ির সদর এই জানলা থেকে দেখা যায়। বাড়িগুলির আলো নিবে গেছে। রাস্তায় দুসারি আলো নিষ্পলক জ্বলছে। রাস্তা দিয়ে দু’একটি লোক কদাচিৎ চলে যাচ্ছে, পঁচিশ গজ দূর থেকে তাদের জুতোর খট্‌খটু শব্দ শোনা যাচ্ছে। আধ-ঘুমন্ত রাত্রি।

ভণ্ডামি করা, মিথ্যে অভিনয় করে মানুষকে ঠকানো, এসব দীপার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবু ঘটনাচক্রে সে দেবাশিসের সঙ্গে লোক ঠকানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে খানিকটা মানসিক ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য। সেজন্য দেবাশিসের কোনো দোষ নেই; সে স্বভাব-ভদ্রলোক, তার প্রকৃতি মধুর। কিন্তু সান্নিধ্য যতাই ঘনিষ্ঠ হোক, দীপা তাকে ভালবাসে না, অন্য একজনকে ভালবাসে। কতকগুলো অভাবনীয় ঘটনা-সমাবেশের ফলে দীপা আর দেবাশিস একত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় দীপা যদি দেবাশিসের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধে বাস করে তাতে দোষ কি? তাকে আড়ালে 'তুমি বললে অন্যায় হবে কেন? কাউকে 'তুমি বললেই কি তার সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ বোঝায়?

মনের অস্বস্তি অনেকটা কমলো। সে আবার গিয়ে বিছানায় শুল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে লক্ষ্য করেনি যে, যতক্ষণ সে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ একটি লোক রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টে ঠেস দিয়ে একদৃষ্টি তার পানে তাকিয়ে ছিল। লক্ষ্য করলে এত সহজে ঘুম আসত না।

০৫. চা খেতে খেতে দেবাশিস বলল

পরদিন সকালবেলা ওপরের বসবার ঘরে চা খেতে খেতে দেবাশিস বলল–'তুমি সারাদিন একলা থাকে, সময় কাটে কি করে?

দীপা চুপ করে রইল। সময় কাটবার তাই কাটে, সময়ের যদি দাঁড়িয়ে পড়বার উপায় থাকত তাহলে বোধহয় দীপার সময় দাঁড়িয়েই পড়ত।

দেবাশিস বলল–'তোমার বই পড়ার শখ নেই; বাড়িতে কিছু বই আছে কিন্তু সেগুলো বিজ্ঞানের বই। তুমি যদি চাও বইয়ের দোকান থেকে গল্প-উপন্যাসের বই এনে দিতে পারি। মাসিক সাপ্তাহিক কাগজের গ্রাহক হওয়া যায়।'

দীপা এবারও চুপ করে রইল। বই পড়তে সে ভালবাসে, ভাল লেখকের ভাল গল্প-উপন্যাস পেলে পড়ে, কিন্তু বই মুখে দিয়ে তো সারা দিন-রাত কাটে না।

'কিংবা তোমাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যেতে পারি, তুমি নিজের পছন্দ মত বই কিনো।' দীপা সংশয় জড়িত স্বরে বলল–'আচ্ছা।'

দেবাশিস বুঝল, বই সম্বন্ধে দীপার বেশি আগ্রহ নেই। তখন সে বলল—'তোমার বান্ধবীদের বাড়িতে ডাকো না কেন? তাদের সঙ্গে গল্প করেও দুদণ্ড সময় কাটবে।'

দীপা বলল–'আচ্ছা, ডাকব।'

চা শেষ করে দেবাশিস জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে অনাদৃত বাগানের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরের দিকে ফিরে বলল–'তুমি ফুল ভালবাস। বাগান করার শখ আছে কি?'

'আছে।' দীপা সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল, এক পা এক পা করে দেবাশিসের কাছে এসে বলল- 'বাপের বাড়িতে ছাদের ওপর বাগান করেছিলুম, টবের বাগান।'

দেবাশিস হেসে বলল–'ব্যস, তবে আর কি, এখানে মাটিতে বাগান কর। বাবা মারা যাবার পর বাগানের যত্ন নেওয়া হয়নি। আমি আজই ব্যবস্থা করছি। আগে একটা মালী দরকার, তুমি একলা পারবে না।'

পরদিন মালী এল, গাড়ি গাড়ি সার এল, কোদাল খন্তা খুরপি গাছকটা কাঁচি এল, নাসরি থেকে মৌসুমী ফুলের বীজ, গোলাপের কলম, বারোমেসে গাছের চারা এল, ছোট ছোট সুপুরিগাছ এল। মহা আড়ম্বরে দীপার জীবনের উদ্যান পর্ব আরম্ভ হয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কাটল। প্রৌঢ় মালী পদ্মলোচন অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার সঙ্গে পরামর্শ করে কোথায় মৌসুমী ফুলের বীজ পোঁতা হবে, কোথায় গোলাপের কলম বসবে, কীভাবে সুপুরি আর ঝাউ-এর সারি বসিয়ে বীথিপথ তৈরি হবে, দীপা তারই প্ল্যান করছে। ঘুমে জাগরণে বাগান ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই।

দেবাশিস নির্লিপ্তভাবে সব লক্ষ্য করে, কিন্তু দীপার কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করে না, এমন কি তাকে বাগান সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেও যায় না। দীপা যা করছে। কারুক, তার যাতে মন ভাল থাকে। তাই ভাল।

দিন কাটছে।

একদিন দুপুরবেলা দীপা রেডিওর মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে ভাবছিল, আরোকোরিয়া পাইন-এর চারাটি বাগানের কোন জায়গায় বসালে ভাল হয়, এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বেজে উঠল। দীপা চকিতে সেই দিকে চাইল, তারপরে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল—'হ্যালো।'

টেলিফোনে আওয়াজ এল–'আমি। গলা চিনতে পারছ?'

দীপার বুকের মধ্যে দু'বার ধকধক করে উঠল। সে যেন ধাক্কা খেয়ে স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এল। একটু দম নিয়ে একটু হাঁপিয়ে বলল—'হ্যাঁ।'

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ।'

‘কোনো গোলমাল হয়নি?’

‘না।‘

‘তোমার স্বামী মানুষটা কেমন?

‘মন্দ মানুষ নয়।’

‘তোমার ওপর জোর-জুলুম করছে না?

‘না।‘

‘একেবারেই না?’

‘না।‘

‘হুঁ। আরো কিছুদিন এইভাবে চালাতে হবে।’

‘আর কত দিন?’

‘সময়ে জানতে পারবে। আচ্ছা।’

ফোন রেখে দিয়ে দীপা আবার আরাম-চেয়ারে এসে বসল, পিছনে মাথা হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। রেডিওর মৃদু গুঞ্জন চলছে। দুমিনিট আগে দীপা বাগানের কথা ভাবছিল, এখন মনে হল বাগানটা বহু দূরে চলে গেছে।

বিকেলবেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় নীচে সদর দোরের ঘন্টি বেজে উঠল। দীপা চোখ খুলে উঠে বসল। কেউ এসেছে। দেবাশিস কি আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এল? কিন্তু আজ তো শনিবার নয়–

দীপা উঠে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল। নকুল দোর খুলছে। তারপরই মেয়েলি গলা শোনা গেল—'আমি দীপার বন্ধু, সে বাড়িতে আছে তো?

নকুল উত্তর দেবার আগেই দীপা ওপর থেকে ডাকল–'শুভ্রা, আয়, ওপরে চলে আয়।'

শুভ্রা ওপরে এসে সিঁড়ির মাথায় দীপকে জড়িয়ে ধরল, বলল—'সেই ফুলশয্যের রাত্রে তোকে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর আসিনি, তোকে হনিমুন করবার সময় দিলুম। আজ ভাবলুম, দীপা আর কনে-বাউ নেই, এত দিনে পাকা গিন্নী হয়েছে, যাই দেখে আসি। হ্যাঁ ভাই, তোর বর বাড়িতে নেই তো?'

'না। আয়, ঘরে আয়।'

শুভ্রা মেয়েটি দীপার চেয়ে বছর দেড়েকের বড়, বছরখানেক আগে বিয়ে হয়েছে। তার চেহারা গোলগাল, প্রকৃতি রঙ্গপ্রিয়, গান গাইতে পারে। প্রকৃতি বিপরীত বলেই হয়তো দীপার সঙ্গে তার মনের সান্নিধ্য বেশি।

বসবার ঘরে গিয়ে তারা পশ্চিমের খোলা জানলার সামনে দাঁড়াল। শুভ্রা দীপাকে ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু হাসল, বলল—'বিয়ের জল গায়ে লাগেনি, বিয়ের আগে যেমন ছিলি এখনো তেমনি আছিস। কিন্তু গায়ে গয়না নেই কেন? হাতে দু'গাছি চুড়ি, কানে ফুল আর গলায় সরু হার; কনে-বউকে কি এতে মানায়।'

দীপা চোখ নামাল, তারপর আবার চোখ তুলে বলল—'তুই তো এখনই বললি আমি আর কনে-বউ নই।'

শুভ্রা বলল–'গয়না পরার জন্য তুই এখনও কনে-বাউ। কিন্তু আসল কথাটা কী? 'আভরণ সৌতিনি মান'?'

'সে আবার কি?'

'তা জানিস না! কবি গোবিন্দদাস বলেছেন, সময়বিশেষে গয়না সতীন হয়ে দাঁড়ায়।' এই বলে দীপার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গাইল–

'সখি, কি ফল বেশ বনান

কানু পরশমণি পরাশক বাধন
আভরণ সৌতিনি মান।’

দীপার মুখের ওপর যেন এক মুঠো আবির ছড়িয়ে পড়ল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল–’যা, তুই বড় ফাজিল।’

শুভ্রা খিলখিল করে হেসে বলল—’তুইও এবার ফাজিল হয়ে যাবি, আর গাম্ভীর্য চলবে না। বিয়ে হলেই মেয়েরা ফাজিল হয়ে যায়।’

দীপা কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কিন্তু যেমন করে হোক সত্যি কথা লুকিয়ে রাখতে হবে, মিথ্যে কথা বলে শুভ্রার চোখে ধুলো দিতে হবে। শুভ্রা যেন জানতে না পারে।

দীপা আকাশ-পাতাল ভাবছে শুভ্রার ঠাট্টার কি উত্তর দেবে, এমন সময় দোরের কাছে থেকে নকুলের গলা এল—’বউদি, চা জলখাবার আনি?’

দীপা যেন বেঁচে গেল। বলল—’হ্যাঁ নকুল, নিয়ে এস।’

নকুল নেমে গেল। দীপা বলল—’আয় ভাই, বসি। তারপর হিমানী সুপ্রিয়া কেমন আছে বল। মনে হচ্ছে যেন কতদিন তাদের দেখিনি!’

শুভ্রা চেয়ারে বসে বলল—'হিমানী সুপ্রিয়ার কথা পরে বলব, আগে তুই নিজের কথা বল। বরের সঙ্গে কেমন ভাব হল?'

দীপা ঘাড় হেঁট করে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল–'ভাল।'

শুভ্রা বলল—'তোর বরটি ভাই দেখতে বেশ। কিন্তু দেখতে ভাল হলেই মানুষ ভাল হয় না। মানুষটি কেমন?'

দীপাবলল–'ভাল।'

শুভ্রা বিরক্ত হয়ে বলল–'ভাল আর ভাল, কেবল এক কথা! তুই কি কোনো দিন মন খুলে কিছু বলবি না?'

'বললুম তো, আর কি বলব?'

'এইটুকু বললেই বলা হল? আমার যখন বিয়ে হয়েছিল। আমি ছুটে ছুটে আসতুম তোর কাছে, সব কথা না বললে প্রাণ ঠাণ্ডা হত না। আর তুই মুখ সেলাই করে বসে আছিস। গা জ্বলে যায়।'

দীপা তার হাত ধরে মিনতির স্বরে বলল–'রাগ করিসনি ভাই! জানিস তো, আমি কথা বলতে গেলেই গলায় কথা আটকে যায়। মনে মনে বুঝে নে না। সবই তো জানিস।'

শুভ্রা বলল—’সবায়ের কি এক রকম হয়? তাই জানতে ইচ্ছে করে। যাক গে, তুই যখন বলবি না। তখন মনে মনেই বুঝে নেব। আচ্ছা, আজ উঠি, তোর বিয়ে পুরনো হোক তখন আবার একদিন আসব।’

দীপা কিন্তু শক্ত করে তার হাত ধরে রইল, বলল–’না, তুই রাগ করে চলে যেতে পাবি না।’

শুভ্রার রাগ অমনি পড়ে গেল, সে হেসে বলল–’তুই হদ্দ করলি। বরের কাছেও যদি এমনি মুখ বুজে থাকিস বর ভুল বুঝবে। ওরা ভুল-বোঝা মানুষ।’

নকল চায়ের ট্রে নিয়ে এল, সঙ্গে স্তুপাকৃতি প্যাসট্রি। দীপা চা ঢেলে শুভ্রাকে দিল, নিজে নিল; দু’জনে চা আর প্যাসট্রি খেতে খেতে সাধারণভাবে গল্প করতে লাগল। শাড়ি ব্লাউজ, গয়নার নতুন ফ্যাশন, সেন্ট স্নো পাউডার-এর দুমূল্যতা, এই সব নিয়ে গল্প। শুভ্রাই বেশি কথা বলল, দীপা সায় উত্তর দিল।

আধা ঘণ্টা পরে চা খাওয়া শেষ হলে নকুল এসে ট্রে তুলে নিয়ে গেল, দীপা তখন বলল–’শুভ্রা, তুই এবার একটা গান গা, অনেক দিন তোর গান শুনিনি।’

শুভ্রা বলল—’কেন, এই তো কানে কানে গান শুনলি। আর কী শুনিবি? মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো?

'না না, ওসব নয়। আধুনিক গান।'

'আধুনিক গানের কথায় মনে পড়ল, পরশু গ্রামোফোনের দোকানে গিয়েছিলুম, প্রবাল গুপ্তর একটা নতুন রেকর্ড শুনলাম। ভারি সুন্দর গেয়েছে। রেকর্ডখানা কিনেছি। তুই শুনেছিস?

দীপা অলসভাবে বলল–'শুনেছি। রেডিওতে প্রায়ই বাজায়। সিনেমার গানের কোনো নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে নাকি?'

শুভ্রা বলল—'শুনিনি। কিন্তু একটা নতুন ছবি বেরিয়েছে, 'দীপ্তি' সিনেমায় দেখাচ্ছে; ছবিটা নাকি খুব ভাল হয়েছে। সুজন হিরো, জোনাকি রায় হিরোইন।'

দীপা একটু নড়েচড়ে বসল, কিছু বলল না। শুভ্রা বলল–'দীপা, ঘরে বসে কি করবি, চল ছবি দেখে আসি। আমার সঙ্গে যদি ছবি দেখতে যাস, তোর বর নিশ্চয় রাগ করবে না।' কব্জির ঘড়ি দেখে বলল—'সওয়া চারটে বেজেছে। তোর বির কাজ থেকে ফেরে। কখন?'

'পাঁচটার সময়।'

'তবে তো ঠিকই হয়েছে। তুই সেজেগুজে তৈরি হতে হতে তোর বর এসে পড়বে, তখন তাকে জানিয়ে আমরা ছবি দেখতে চলে যাব। আর তোর বর। যদি সঙ্গে যেতে চায় তাহলে তো আরো ভাল।'

দীপার ইচ্ছে হল শুভ্রার সঙ্গে ছবি দেখতে যায়। দেবাশিস কোনো আপত্তি তুলবে না। তাও সে জানে। তবু তার মনের একটা অংশ তার ইচ্ছাকে পিছন থেকে টেনে ধরে রইল, তাকে যেতে দেবে না। সে কাচুমাচু হয়ে বলল–'আজ থাক ভাই, আর একদিন যাব।'

শুভ্রা আরো কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু দীপা রাজী হল না। শুভ্রা তখন বলল—'বুঝেছি, তুই বর-হাংলা হয়েছিস, বরকে ছেড়ে নড়তে পারিস না। বিয়ের পর কিছু দিন আমারও হয়েছিল।' সে নিজের বর-হ্যাংলামির গল্প বলতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল–'পাঁচটা বাজে, আমি পালাই, এখনই তোর বর এসে পড়বে। আমি থাকলে তোদের অসুবিধে হবে। আবার একদিন আসব।' শুভ্র হাসতে হাসতে চলে গেল।

তাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দীপা ভাবতে লাগল, কি আশ্চর্য মনের কথা মুখ ফুটে না বললে কি কেউ বুঝতে পারে না! সবাই ভাবে, যা গতানুগতিক তাই সত্যি!

তারপর দিন কাটছে।

একদিন বেশ গরম পড়েছে। গুমোট গরম, বাতাস নেই; তাই মনে হয়। শীগগিরই ঝড়-বৃষ্টি নামবে। দেবাশিস বিকেলবেলা ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দেখল, দীপা আর পদ্মলোচন দড়ি ধরে বাগান মাপজোক করছে। দেবাশিসকে দেখে দীপা দড়ি ফেলে তাড়াতাড়ি তার গাড়ির কাছে এল, বেশ উত্তেজিতভাবে বলল–'ঈস্টার লিলিতে কুঁড়ি ধরেছে। দেখবে?

দেবাশিস গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল–'তাই নাকি! কোথায় ঈস্টার লিলি?'

'এস, দেখাচ্ছি।'

বাগানের এক ধারে দীপা আঙুল দেখাল। দেবাশিস দেখল, ভূমিলগ্ন ঝাড়ের মাঝখান থেকে ধ্বজার মত ডাঁটি বেরিয়েছে, তার মাথায় তিন-চারটি কুঁড়ির পতাকা। স্নিগ্ধ হেসে দেবাশিস দীপর পানে চাইল–'তোমার বাগানের প্রথম ফুল।'

হাসতে গিয়ে দীপা থেমে গেল। 'তোমার বাগানের–', বাগান কি দীপার? হঠাৎ তার মনটা বিকল হয়ে গেল, প্রথম মুকুলোদগম দেখে যে আনন্দ হয়েছিল তা নিবে গেল।

সন্ধ্যের পর নৃপতির আড্ডায় গিয়ে দেবাশিস দেখল আড্ডাধারীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত, বেশ উত্তেজিতভাবে আলোচনা চলছে। তাকে দেখে সকলে কলরব করে উঠল–'ওহে, শুনেছি?'

সুজন থিয়েটারী পোজ দিয়ে বলল–’আবার শজারুর কাঁটা।’

নৃপতি বলল–’এস, বলছি। তুমি কাগজ পড় না, তাই জান না। মাসখানেক আগে একটা ভিখিরিকে কেউ শজারুর কাঁটা ফুটিয়ে মেরেছিল মনে আছে?

দেবাশিস বলল—’হ্যা, মনে আছে।’

‘পরশু রাত্রে একটা মজুর লেকের ধারে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার হৃদযন্ত্রে শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে কেউ তাকে খুন করেছে।’

দেবাশিস বলল–’কে খুন করেছে, জানা যায়নি?’

নৃপতি একটু হেসে বলল–’না, পুলিস তদন্ত করছে।’

কপিল বলল—’পুলিস অনন্তকাল ধরে তদন্ত করলেও আসামী ধরা পড়বে না। অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভিখিরি এবং মজুরের হত্যাকারী একই লোক। এ ছাড়া আর কেউ কিছু বুঝতে পেরেছ কি?’

খড়্গা বাহাদুর বলল—’দুটো খুনই আমাদের পাড়ায় হয়েছে, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে। যে হত্যাকারী আমাদের পাড়ার লোক।’

নৃপতি বলল–'তা নাও হতে পারে। হত্যাকারী হয়তো টালার লোক।'

এই সময় কফি এল। প্রবাল এতক্ষণ পিয়ানোর সামনে মুখ গোমড়া করে বসে ছিল, আলোচনার হল্লায় বাজাতে পারছিল না; এখন উঠে এসে এক পেয়ালা কফি তুলে নিল। কপিল তাকে প্রশ্ন করল–'কি হে মিঞা তানসেন, তোমার কি মনে হয়?'

প্রবাল কফির পেয়ালায় একবার ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল–'আমার মনে হয় হত্যাকারী উম্মাদ এবং তোমরাও বদ্ধ পাগল!'

সবাই হইচই করে উঠল–'আমরা পাগল কেন?'

প্রবাল বলল—'তোমরা হয় পাগল নয়। ভণ্ড। একটা কুলিকে যদি কেউ খুন করে থাকে তোমাদের এত মাথাব্যথা কিসের? কুলির শোকে তোমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে এই কথা বোঝাতে চাও?'

অতঃপর তর্ক উদাম এবং উত্তাল হয়ে উঠল।

দেবাশিস তর্কাতর্কি বাগযুদ্ধ ভালবাসে না। সে কফি শেষ করে চুপিচুপি পালাবার চেষ্টায় ছিল, নৃপতি তা লক্ষ্য করে বলল–'কি হে দেবাশিস, চললে নাকি?'

দেবাশিস বলল—'হ্যা, আজ যাই নৃপতিদা।'

'নৃপতি বলল—'আচ্ছা, এস। সাবধানে পথ চলবে। দক্ষিণ কলকাতার পথেঘাটে এখন দলে দলে পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

এক ধমক হাসির উচ্ছাসের সঙ্গে দেবাশিস বেরিয়ে এল। সে দু'চার পা চলেছে, এমন সময় শুনতে পেল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে গোঁ গোঁ মড়মড় আওয়াজ আসছে। চকিতে আকাশের দিকে চোখ তুলে সে দেখল মেঘ ছুটে আসছে; গুমোট ফেটে ঝড় বেরিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে একঝাঁক জেট বিমানের মত ঝড় এসে পড়ল; বাতাসের প্রচণ্ড দাপটে চারদিক এলোমেলো হয়ে গেল।

দেবাশিস হাওয়ার ধাক্কায় টাল খেতে খেতে একবার ভাবল, ফিরে যাই, নৃপতিদার বাড়ি বরং কাছে; তারপর ভাবলা, ঝড় যখন উঠেছে তখন নিশ্চয় বৃষ্টি নামবে, কতক্ষণ ঝড়-বৃষ্টি চলবে ঠিক নেই; সুতরাং বাড়ির দিকে যাওয়াই ভাল, হয়তো বৃষ্টি নামার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব।

দেবাশিস ঝড়ের প্রতিকূলে মাথা ঝুকিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু বেশি দূর চলতে হল না, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল; বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা তার সবঙ্গে ভিজিয়ে দিল।

বাড়িতে ফিরে দেবাশিস সটান ওপরে চলে গেল। দীপা নিজের ঘরে ছিল, বন্ধ জানলার কাচের ভিতর দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল; দেবাশিস জোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই সে ফিরে

দাঁড়িয়ে দেবাশিসের সিক্ত মূর্তি দেখে সশঙ্ক নিশ্বাস টেনে চক্ষু বিস্ফারিত করল। দেবাশিস লজ্জিতভাবে 'ভিজে গেছি বলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

দশ মিনিট পরে শুকনো জামাকাপড় পরে সে বেরিয়ে এল, তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে দেখল, দীপা যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল—'নৃপতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। চল, খাবার সময় হয়েছে।'

পরদিন সকালে গায়ে দারুণ ব্যথা নিয়ে দেবাশিস ঘুম থেকে উঠল। বৃষ্টিতে ভেজার ফল, সন্দেহ নেই; হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জায় দাঁড়াবে। দেবাশিস ভাবল আজ আর কাজে যাবে না। কিন্তু সারা দিন বাড়িতে থাকলে বার বার দীপার সংস্পর্শে আসতে হবে, নিরর্থক কথা বলতে হবে; সে লক্ষ্য করেছে। রবিবারে দীপা যেন শঙ্কিত আড়ষ্ট হয়ে থাকে। কী দরকার? সে গায়ের ব্যথার কথা কাউকে বলল না, যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে ফ্যাক্টরি চলে গেল।

বিকেলবেলা সে গায়ে জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। জলখাবার খেতে বসে সে নকুলকে বলল– 'নকুল, আমার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, রাত্তিরে ভাত খাবো না।'

নকুল বলল—'কাল রাত্তিরে যা ভেজাটা ভিজেছ, ঠাণ্ডা তো লাগবেই। তা ডাক্তারবাবুকে খবর দেব? '

দেবাশিস বলল—’আরে না না, তেমন কিছু নয়। গোটা দুই অ্যাসপিরিন খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।’

রাত্রে সে খেতে নামল না। খাবার সময় হলে দীপা নীচে গিয়ে নকুলকে বলল–’নকুল, ওর খাবার তৈরি হয়ে থাকে তো আমাকে দাও, আমি নিয়ে যাই।’

নকুল একটা ট্রে-র উপর সুপের বাটি, টোস্ট এবং স্যালাড সাজিয়ে রাখছিল, বলল–’সে কি বউদি, তুমি দাদাবাবুর খাবার নিয়ে যাবে! আমি তাহলে রয়েছি কি কত্তে? নাও, চল।’

ট্রে নিয়ে নকুল আগে আগে চলল, তার পিছনে দীপা। দীপার মন ধুকপুক করছে। ওপরে উঠে নকুল যখন দীপার ঘরের দিকে চলল, সে তখন ক্ষীণ কুণ্ঠিত স্বরে বলল—‘ওদিকে নয় নকুল, এই ঘরে।’

নকুল ফিরে দাঁড়িয়ে দীপার পানে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল, তারপর অন্য ঘরে গিয়ে দেখল দেবাশিস বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। নকুল খাটের পাশে গিয়ে সন্দেহভরা গলায় বলল—’তুমি এ ঘরে শুয়েছ যে, দাদাবাবু!’

ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরেছে তাই আলাদা শুয়েছি। ছোঁয়াচে রোগ, শেষে দীপাকেও ধরবে।’

সন্তোষজনক কৈফিয়ত। দীপা নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। নকুলও আর কিছু বলল না, কিন্তু তার চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে রইল। সে যেন বুঝেছে, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি হচ্ছে না, কোথাও একটু গলদ রয়েছে।

ঘণ্টা তিনেক পরে দীপা নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, দোরে ঠকঠক শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম-চোখে উঠে দোর খুলেই সে প্রায় অতিকে উঠল। দেবাশিস বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—'বুকে দারুণ ব্যথা, জ্বরও বেড়েছে...ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।' এই বলে সে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

আকস্মিক বিপৎপাত মানুষের মন ক্ষণকালের জন্য অসাড় হয়ে যায়। তারপর সংবিৎ ফিরে আসে। দীপা স্বস্থ হয়ে ভাবল, ডাক্তার ডাকতে হবে; কিন্তু এ বাড়ির বাঁধা। ডাক্তার কে তা সে জানে না, তাঁকে ডাকতে হলে নকুলকে পাঠাতে হবে; তাতে অনেক দেরি হবে। তার চেয়ে যদি সোনকাকাকে ডাকা যায়–

দীপা ডাক্তার সুহৃৎ সেনকে টেলিফোন করল। ডাক্তার সেন দীপার বাপের বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার।

একটি নিদ্রালু স্বর শোনা গেল-'হ্যালো।'

দীপা বলল–'সোনকাকা! আমি দীপা।'

'দীপা! কী ব্যাপার?'

'আমি-আমার-? দীপা ঢোক গিলল—'আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখনই ডাক্তার চাই। আমি জানি না। এঁদের ডাক্তার কে, তাই আপনাকে ডাকছি। আপনি এক্ষুনি আসুন সেনকাকা।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি। কিন্তু অসুখের লক্ষণ কি?

'বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছিল–তারপর–'

'আচ্ছা, আমি আসছি।'

'বাড়ি চিনে আসতে পারবেন তো?'

'খুব পারব! এই তো সেদিন তোমার বউভাতের নেমন্তন্ন খেয়েছি।'

মিনিট কুড়ির মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন, ওপরে গিয়ে দেবাশিসের পরীক্ষা শুরু করলেন। দীপা দোরের চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

প্রথমে কয়েকটা প্রশ্ন করে ডাক্তার রোগীর নাড়ি দেখলেন, টেম্পরেচার নিলেন, তারপর স্টেথস্কোপ কানে লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করতে করতে তাঁর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হল, তিনি বলে উঠলেন–'এ কি?'

দেবাশিস ক্লিষ্ট স্বরে বলল—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমার সবই উল্টে।'

দীপা সচকিত হয়ে উঠল, কিন্তু দেবাশিস আর কিছু বলল না। ডাক্তার কেবল ঘাড় নাড়লেন।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন–'বুকে বেশ সর্দি জমেছে। আমি ইঞ্জেকশন দিচ্ছি, তাতেই কাজ হবে। আবার কাল সকালে আমি আসব, যদি দরকার মনে হয় তখন রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ করা যাবে।'

ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবাশিসের মাথায় হাত বুলিয়ে ডাক্তার সস্নেহে বললেন–'ভয়ের কিছু নেই, দু' চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। আচ্ছা, আজ ঘুমিয়ে পড় বাবাজি, কাল ন'টার সময় আবার আমি আসব। তোমার বাড়ির ডাক্তারকেও খবর দিও।'

ডাক্তার ঘর থেকে বেরুলেন, দীপা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার সেন দীপাকে বললেন–'একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম–'

'কি দেখলেন?'

ডাক্তার যা দেখেছেন দীপাকে বললেন।

দিন দশেকের মধ্যে দেবাশিস আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। এই দশটা দিন অসুখের সময় হলেও দেবাশিসের পক্ষে বড় সুখের সময়। দীপা ঘুরে ফিরে তার কাছে আসে, খাটের কিনারায় বসে তার সঙ্গে কথা বলে; তার খাবার সময় হলে নীচে গিয়ে নিজের হাতে খাবার নিয়ে আসে, নকুলকে আনতে দেয় না। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে চুপিচুপি এসে তাকে দেখে যায়; আধ-জাগা আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় দেবাশিস জানতে পারে।

একদিন, দেবাশিস তখন বেশ সেরে উঠেছে, বিকেলবেলা পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বিছানায় আধ-বসা হয়ে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে, দীপা দুধ-কোকোর পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেবাশিস হেসে তার হাত থেকে পেয়ালা নিল, দীপা খাটের পায়ের দিকে গিয়ে বসল। বলল-‘দাদা ফোন করেছিল, সন্ধ্যের পর আসবে।’

দেবাশিস উত্তর দিল না, কোকোর কাপে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে দীপার। পানে চেয়ে রইল। বলা বাহুল্য, গত দশ দিনে দীপার বাপের বাড়ি থেকে রোজই কেউ না কেউ এসে তত্ত্ব-তল্লাশ নিয়ে গেছে। দীপার মা গোড়ার দিকে দু’ রাত্রি এসে এখানে ছিলেন। কিন্তু দীপা তার মা’র। এখানে থাকা মনে মনে পছন্দ করেনি।

দেবাশিস কাপে চুমুক দিচ্ছে আর চেয়ে আছে, দীপা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একটা কিছু বলবার জন্যে সে বলল—‘বাগানে বোধ হয় আরো কিছু ক্রোটন দরকার হবে।’

এবারও দেবাশিস তার কথায় কান দিল না। খিন্ন-মধুর স্বরে বলল–’দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।’

নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত কথা। দীপার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, তারপরই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে দোরের দিকে পা বাড়িয়ে স্খলিত স্বরে বলল–’বোধ হয় মালী এসেছে, যাই, দেখি সে কি করছে।’

পিছন থেকে দেবাশিস ডাকলা–’দীপা, শোনো।’

দীপা দুরুদুরু বুকে ফিরে এসে দাঁড়াল। দেবাশিসের মুখের সেই খিন্না-করুণ ভাব আর নেই, সে খালি পেয়ালা দীপকে দিয়ে সহজ সুরে বল—’আমার কয়েকজন বন্ধুকে চায়ের নেমন্তন্ন করতে চাই। চার-পাঁচ জনের বেশি নয়।’

দীপা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল–’কবে?’

‘তাড়া নেই। আজ রবিবার, ধরো আসছে রবিবারে যদি করা যায়?’

'আচ্ছা।'

'বাজারের খাবার কিন্তু একটুও থাকবে না। সব খাবার তুমি আর নকুল তৈরি করবে।'

'আচ্ছা।'

তারপর দিন কাটছে। দেবাশিস আবার ফ্যাক্টরি যেতে আরম্ভ করল। শনিবার সন্ধ্যায়। নৃপতির আড়ায় গেল। অনেক দিন পরে তাকে দেখে সবাই খুশি। এমন কি প্রবাল পিয়ানোয় বসে একটা হাল্কা হাসির গৎ বাজাতে লাগল। নৃপতি বলল–'একটু রোগা হয়ে গেছ।'

খড়্গা বাহাদুর বলল–'ভাই দেবু, ঠেসে শিককাবাব খাও, দু' দিনে ইয়া লাশ হয়ে যাবে।'

কপিল বলল–'খড়্গ, তুই থাম! তুই তো দিনে দেড় কিলো শিককাবাব খাস, তবে গায়ে গত্তি লাগে না কেন?'

খড়্গা বলল–'আমি যে ফুটবল খেলি, যারা ফুটবল খেলে তারা কখনো মোটা হয় না। মোটা ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছিস?'

সুজন বলল—'কুস্তিগীর পালোয়ানেরা কিন্তু মোটা হয়। শুনেছি তারা হরদম পেস্তা আর বেদোনর রস খায়।'

এই সময় বিজয়মাধব এল। দেবাশিসকে দেখে তার কাছে এসে বলল–'অসুখের পর এই প্রথম এলে, না?'

দেবাশিস বলল–'হ্যাঁ।'

'এখন তাহলে একেবারে ঠিক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

দেবাশিসের কাছে কথা বলার বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে বিজয় বিরস মুখে তক্তপোশের ধারে গিয়ে বসল। দেবাশিস তখন সকলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল–'তোমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছি। কাল রবিবার সাড়ে পাঁচটার পর যখন ইচ্ছে আসবে। কেমন, কারুর অসুবিধে নেই তো?'

কারুর অসুবিধে নেই। সবাই সানন্দে রাজী। কেবল খড়্গা বাহাদুর বলল—'কাল আমার খেলা আছে। তবু আমি যত শীগগির পারি যাব। চায়ের সঙ্গে শিককাবাব খাওয়াবে তো?'

কপিল বলল—’তুই জ্বালালি। চায়ের সঙ্গে কেউ শিককাবাব খায়? শিককাবাবের অনুপান হচ্ছে বোতল।’

দেবাশিস প্রবালের দিকে চেয়ে বলল—’তুমি আসবে তো?’

প্রবাল বলল—’যাব। বড়মানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন আমি কখনো উপেক্ষা করি না। কিন্তু উপলক্ষটা কি? রোগমুক্তির উৎসব?

দেবাশিস বলল–’আমার বউয়ের হাতের তৈরি খাবার তোমাদের খাওয়াব। বিজয়, তুমিও a

‘যাব।’

০৬. অতিথিরা একে একে এসে উপস্থিত

পরদিন সন্ধ্যেবেলা দেবাশিসের বাড়িতে অতিথিরা একে একে এসে উপস্থিত হল। এমন কি খড়্গা বাহাদুরও ঠিক সময়ে এল, বলল–'খেলা হল না, ওয়াকওভার পেয়ে গেলাম।'

নীচের তলার বসবার ঘরে আড়া জমল। সকলে উপস্থিত হলে দেবাশিস এক ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, দীপা খাবারের প্লেট সাজাচ্ছে আর নকুল দুটো বড় বড় টি-পটে চা তৈরি করছে। দেবাশিস দীপাকে বলল-'ওরা সবাই এসে গেছে। দশ মিনিট পরে চা জলখাবার নিয়ে তুমি আর নকুল যেও।'

'আচ্ছা।' দীপা জানত না। কারা নিমন্ত্রিত হয়েছে, তার মনে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। অস্পষ্টভাবে ভেবেছিল, হয়তো ফ্যাক্টরির সহকর্মী বন্ধু।

বসবার ঘরে আলোচনা শুরু হয়েছে, আজকের কাগজে নতুন শজারুর কাঁটা হত্যার খবর বেরিয়েছে তাই নিয়ে। এবার শিকার হয়েছে এক দোকানদার, গুণময় দাস। এবারও অকুস্থল দক্ষিণ কলকাতা।

আলোচনায় নতুনত্র বিশেষ নেই। হত্যাকারী হয় পাগল, নয়। পাকিস্তানী, নয়। চীনেম্যান। সুজন বলল–'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? প্রথমে ভিখিরি, তারপর মজুর, তারপর দোকানদার। হত্যাকারী স্তরে স্তরে উঁচু দিকে উঠছে। এর পরের বারে কে শিকার হবে ভাবতে পার?'

প্রবাল গলার মধ্যে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করল। কপিল বলল—'সম্ভবত নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়।'

খড়্গা বাহাদুর বলল—'কিংবা নামজাদা সিনেমা অ্যাক্টর।'

সুজন বলল–'কিংবা নাম-করা গাইয়ে।'

প্রবাল বলল-নাম-করা লোককেই মারবে এমন কী কথা আছে? পয়সাওয়ালা লোককেও মারতে পারে। যেমন নৃপতিদা কিংবা কপিল কিংবা-'

এই সময় দীপা খাবারের ট্রে হাতে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রবালের কথা শেষ হল না, সবাই হাসিমুখে উঠে। দীপকে মহিলার সম্মান দেখাল। দীপা একবার ত্রাস-বিস্ফারিত চোখ সকলের দিকে ফেরাল, তার মুখ সাদা হয়ে গেল। প্রবল চেষ্টায় সে নিজের দেহটাকে সামনে চালিত করে টেবিলের ওপর খাবারের ট্রে রাখল।

কপিল মৃদু ঠাট্টার সুরে বলল—'নমস্কার, মিসেস ভট্ট।'

দীপা বোধ হয় শুনতে পেল না, সে ট্রে রেখেই পিছু ফিরল। তার পিছনে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নকুল ছিল, তাকে পাশ কাটিয়ে দীপা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবাশিস অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে আশা করেছিল, দীপা সকলকে চা ঢেলে দেবে, সকলেই বিয়ের আগে থেকে পরিচিত, তাদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলবে, তাদের খাওয়ার তদারক করবে। কিন্তু দীপা কিছুই করল না। দেবাশিস নিজেই সকলকে চা ঢেলে দিল। ট্রের ওপর থেকে খাবারের প্লেট নামিয়ে তাদের সামনে রাখল। দীপা আজ নকুলের সাহায্যে অনেক রকম খাবার তৈরি করেছিল; চিংড়ি মাছের কাটলেট, হিঙের কচুরি, ডালের ঝালবড়া, রাঙালুর পুলি, জমাট ক্ষীরের বিরফি ইত্যাদি। অতিথিরা খেতে খেতে আবার তর্কবিতর্কে মশগুল হয়ে উঠল। দীপার ব্যবহারে সামান্য অস্বাভাবিকতা কেউ লক্ষ্যও করল। কিনা বলা যায় না।

আলোচনা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন দেবাশিস অতিথিদের দৃষ্টি এড়িয়ে রান্নাঘরে গেল। দেখল, দীপা টেবিলের ওপর কনুই রেখে আঙুল দিয়ে দুই রাগ টিপে বসে আছে। দেবাশিস তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে হতাশ চোখ তুলে বলল-বিড় মাথা ধরেছে।'

দেবাশিসের মন মুহূর্তমধ্যে হাল্কা হয়ে গেল। সে সহানুভূতির সুরে বলল–'ও—আগুনের তাতে মাথা ধরেছে। তুমি আর এখানে থেকে না, নিজের ঘরে চলে যাও, মাথায় অডিকলোন দিয়ে শুয়ে থাকো গিয়ে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাথা ধরা সেরে যাবে।'

দীপা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে বলল—'আচ্ছা।'

দেবাশিস বসবার ঘরে ফিরে গিয়ে বলল–'দীপার খুব মাথা ধরেছে। আমি তাকে মাথায় অডিকেলন দিয়ে শুয়ে থাকতে বলেছি। আজ সারা দুপুর উনুনের সামনে বসে খাবার তৈরি করেছে।'

সকলেই সহানুভুতিসূচক শব্দ উচ্চারণ করল। বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল–'আমি যাই, দীপাকে একবার দেখে আসি।'

দেবাশিস বলল—'যাও-না, সোজা ওপরে চলে যাও।'

বিজয় দোতলায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দীপার শোবার ঘরের দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দীপা চোখ বুজে শুয়ে ছিল, সাড়া পেয়ে ঘাড় তুলে বিজয়কে দেখল, তারপর আবার বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজল।

বিজয় খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, কটমট করে দীপার পানে চেয়ে থেকে চাপা তর্জনে বলল–'আমার সঙ্গে চালাকি করিসনে, তোর মাথাধরার কারণ আমি বুঝেছি।'

দীপা উত্তর দিল না, চোখ বুজে পড়ে রইল। বিজয় তর্জনী তুলে বলল—'আজ যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তোর ইয়ে—।'

দীপার কাছ থেকে সাড়াশব্দ নেই।

'তার নাম কি, বল।'

দীপার মুখে কথা নেই, সে যেন কালা হয়ে গেছে।

'বলবি না?'

এইবার দীপা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসল, তীব্র দৃষ্টিতে বিজয়ের পানে চেয়ে বলল—'না, বলব না।' এই বলে সে বিজয়ের দিকে পিছন ফিরে আবার শুয়ে পড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিজয় বলল-'বলবিনে! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। যেদিন ধরব তাকে, চৌ-রাস্তার ওপর টেনে এনে জুতো পেটা করব।'

বিজয় নীচে নেমে গেল। ভাই-বোনের ঝগড়ার মূলে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল–

তারপর আবার দিন কাটছে।

প্রত্যেক মানুষের দুটো চরিত্র থাকে; একটা তার দিনের বেলার চরিত্র, অন্যটা রাত্রির। বেরালের চোখের মত; দিনে একরকম, রাত্রে অন্যরকম।

এই কাহিনীতে যে ক'টি চরিত্র আছে তাদের মধ্যে পাঁচজনের নৈশ জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। হয়তো অপ্রত্যাশিত নতুন তথ্য জানা যাবে।

একটি রাত্রির কথা :

সাড়ে দশটা বেজে গেছে। নৃপতি নৈশাহার শেষ করে নিজের শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। জোড়া-খাটের ওপর চওড়া বিছানা; তার বিবাহিত জীবনের খাট-বিছানা। এখন সে একাই শোয়। শুয়ে বই পড়ে, বই পড়তে পড়তে ঘুম এলে বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেয়।

আজ কিন্তু বই পড়তে পড়তে তার মন ছটফট করছে, পড়ায় মন বসছে না। প্রায় আধা ঘণ্টা বইয়ে মন বসাবার বৃথা চেষ্টা করে সে উঠে পড়ল, আলো নিবিয়ে জানলার নীচে আরাম-চেয়ারে এসে বসল। আকাশে চাঁদ আছে, বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন। সে সিগারেট ধরাল।

আজ কোন তিথি? পূর্ণিমা নাকি? হপ্তা দুই আগে নৃপতি যখন গভীর রাত্রে বেরিয়েছিল তখন কৃষ্ণপক্ষ ছিল, বোধ হয় অমাবস্যা। মানুষের মনের সঙ্গে তিথির কি কোনো সম্পর্ক আছে? একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বাতের ব্যথা বাড়ে, একথা আধুনিক ডাক্তারেরাও স্বীকার করেন। নৃপতি গলার মধ্যে মৃদু হাসল। বাতের ব্যথাই বটে।

'বাবু!'

নৃপতির খাস চাকর দীননাথ তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নৃপতি পাশের দিকে ঘাড় ফেরাল। দিনু বলল–'আপনার ঘুম আসছে না, এক কাপ ওভালটিন তৈরি করে দেব?

নৃপতি একটু ভেবে বলল-না, থাক। আমি বেরুবা, তুই শেষ রাত্রে দোর খুলে রাখিস।'

'আচ্ছা, বাবু।'

দিনু প্রভুভক্ত চাকর; সে জানে নৃপতি মাঝে মাঝে নিশাভিসারে বেরোয়, কিন্তু কাউকে বলে না। বাড়ির অন্য চাকর-বাকর ঘৃণাক্ষরেও জানতে পারে না।

দিনু চলে যাবার পর নৃপতি উঠে আলো জ্বালল, ওয়ার্ডরোব থেকে এক সেট ধূসর রঙের বিলিতি পোশাক বের করে পরল, পায়ে রবার-সোল জুতো পরল; স্টিলের কাবার্ড থেকে একটা চশমার খাপের মত লম্বাটে পার্স নিয়ে বুকপকেটের ভিতর দিকে রাখল। তারপর ছফুট লম্বা আয়নায় নিজের চেহারা একবার দেখে নিয়ে আলো নিবিয়ে দিল। বাড়ির পিছন দিকে চাকরদের যাতায়াতের জন্যে ঘোরানো লোহার সিড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল।

নৃপতি কোথায় যায়? সে বিপত্নীক, তার কি কোনো গুপ্ত প্রণয়িনী আছে?

আর একটি রাত্রির কথা :

গোল পার্ক থেকে যে কটা সরু রাস্তা বেরিয়েছে তারই একটা দিয়ে কিছুদূর গেলে একটা পুরনো দোতলা বাড়ি চোখে পড়ে; এই বাড়ির একতলায় গোটা তিনেক ঘর নিয়ে প্রবাল গুপ্ত থাকে। পুরনো বাড়ির পুরনো ভাড়াটে; ভাড়া কম দিতে হয়।

বাসাটি মন্দ নয়। কিন্তু প্রবালের প্রকৃতি একটু অগোছালো, তাই তার স্ত্রী মারা যাবার পর বাসাটি শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সদরের বসবার ঘরে মেঝের ওপর শতরঞ্জি পাতা। দেয়াল ঘেঁষে এক জোড়া বাঁয়োতবলা, হারমোনিয়াম এবং তাল রাখার একটা ছোট যন্ত্র। প্রবাল যে সঙ্গীতশিল্পী্ৃ, বাসায় এ ছাড়া তার অন্য কোনো নিদর্শন নেই।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় প্রবাল সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিল। আজ সে নৃপতির আড্ডায় যায়নি। একটা গানে সুর লাগিয়ে তৈরি করছিল, আসছে হাপ্তায় দমদমে গিয়ে সেটা রেকর্ড করতে হবে। সে নিজেই গানে সুর দেয়; আজ গানটাকে ঠিক রেকর্ডের মাপে তৈরি করছিল। তিন মিনিট কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে গান গেয়ে শেষ করতে হবে।

তালের যন্ত্রটাতে দম দিয়ে সে চালু করে দিল, যন্ত্রটা ঘড়ির দোলকের মত কটকটু শব্দ করে দুলতে লাগল। প্রবাল পকেট থেকে স্টপ-ওয়াচ বের করে হারমোনিয়ামের ওপর রাখল, তারপর স্টপ-ওয়াচের মাথা টিপে চালিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে গাইতে আরম্ভ করল, তার আঙুল খুব লঘু স্পর্শে হরমোনিয়ামের চাবির ওপর খেলে বেড়াতে লাগল।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্টপ-ওয়াচ বন্ধ করল, দেখল তিন মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড হয়েছে। সে তখন তালের যন্ত্রটাকে চাবি ঘুরিয়ে একটু দ্রুত করে দিয়ে আবার স্টপ-ওয়াচ ধরে গাইতে শুরু করল।

এইভাবে প্রায় আধা ঘণ্টা চলল। নিঃসঙ্গ গায়ক আপন মনে গেয়ে চলেছে।

দোরে খট্‌খট্‌ করে টোকা পড়ল। প্রবাল উঠে গিয়ে দোর খুলে দিল; একটা চাকর এক থালা অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবালের বাসায় রান্নাবান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই; কাছেই একটা হোটেল আছে, সেখান থেকে দু' বেলা তার খাবার দিয়ে যায়।

চাকরটি শতরঞ্জির এক কোণে থালা রেখে চলে গেল। প্রবাল দোর বন্ধ করে সেখানেই খেতে বসল। এমনিভাবে সে যেন দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। হয়তো দূর ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি রেখে সে চলেছে, তাই বর্তমান সম্বন্ধে তার মন সম্পূর্ণ উদাসীন।

নৈশাহার শেষ করে প্রবাল বাসায় তালা লাগিয়ে বেরুল। মোড়ের মাথায় একটা পানের দোকান আছে, সেখানে গিয়ে পান। কিনে মুখে দিল, একটা গোল্ড ফ্লেক সিগারেট ধরাল। প্রবাল নিজের কাছে সিগারেট রাখে না, পাছে বেশি খাওয়া হয়ে যায়; প্রত্যহ রাত্রে দোকান থেকে একটি সিগারেট কিনে খায়। যারা পেশাদার গাইয়ে, গলা সম্বন্ধে তাদের সতর্কতার অন্ত নেই। বেশি। ধূমপান করলে নাকি গলা খারাপ হয়ে যায়।

পানের দোকানো একটি ছোট্ট ট্রানজিস্টার গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে। প্রবাল শুনল, তারই গাওয়া একটি গানের রেকর্ড বাজছে। সে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ নিজের গাওয়া গান শুনল, তারপর সিগারেট টানতে টানতে এগিয়ে চলল।

সাদার্ন অ্যাভেনু তখন জনবিরল হয়ে এসেছে। প্রবাল রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং-এর ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলল। তার মগজের মধ্যে কখনও গানের কলি গুঞ্জন তুলছে..প্রেমের সাগর দুলে দুলে ওঠে সখি...। কখনও একটা ক্রুদ্ধ ভোমরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে.দুনিয়ায় যার টাকা নেই সে কিসের লোভে বেঁচে থাকে?...

রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং অনেক দূর এসে যেখানে পুব দিকে মোড় ঘুরেছে তার কাছাকাছি একটা খিড়কির ফটক আছে। প্রবাল সেই ফটক দিয়ে লেকের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করল।

ঝিলিমিলি আবছা আলোয় কিছুদূর যাবার পর একটা গাছের তলায় শূন্য বেঞ্চি চোখে পড়ল। প্রবাল বেঞ্চিতে গিয়ে বসল, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তার গলার মধ্যে অবরুদ্ধ হাসির মত শব্দ হল। ...

সেরাত্রে প্রবাল যখন বাসায় ফিরল। তখন বারোটা বাজতে বেশি দেরি নেই। কলকাতা শহরের চোখ তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু।

আর একটি রাত্রির কথা :

খড়্গা বাহাদুর আজ আড্ডায় যায়নি; তার কারণ তার বাড়িতেই আজ আড্ডা বসবে। অবশ্য অন্যরকম আড্ডা; অতিথিরাও অন্য। এইরকম আডা মাসে দু’ তিন বার বসে।

খড়্গা বাহাদুর একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। ছোট হলেও ফ্ল্যাটটি তার পক্ষে যথেষ্ট। সে একলা থাকে, সঙ্গী একমাত্র স্বদেশী সেবক রতন সিং। রতন সিং একাধারে তাঁর ভৃত্য এবং পাচক, ভাল শিককাবাব তৈরি করতে পারে।

সামনের ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো, দেখলেই বোঝা যায় অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। মাঝখানে একটি তাঁস খেলার টেবিল ঘিরে গোটা চারেক গদি-মোড়া চেয়ার, মাথার ওপর একশো ওয়াটের দুটো বালব জ্বলছে। এই টেবিলের সামনে একলা বসে খড়্গা বাহাদুর এক প্যাক তাস নিয়ে ভাঁজিছিল। আরো দুটো নতুন তাসের সীল-করা প্যাক পাশে রাখা রয়েছে। খড়্গা বাহাদুর অলসভাবে তাস ভাঁজছিল, কিন্তু তার মুখের ভাব কড়া এবং রুক্ষ। নৃপতির আড্ডায় তার যেমন হাসিখুশি মিশুক ভাব দেখা যায়, বাড়িতে ঠিক তেমন নয়। বাড়িতে সে প্রভু। মধ্যযুগীয় প্রভু।

পৌঁনে আটটা বাজলে খড়্গা বাহাদুর ডাকল—’রতন সিং!’

রতন সিং রান্নাঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো মানুষ, খাঁটি নেপালী চেহারা; ভাবলেশহীন। তির্যক চোখে চেয়ে বলল—’জি।’

খড়্গা বাহাদুর বলল—'আটটার পরেই অতিথিরা আসবে। শিককাবাব কত দূর?

রতন সিং বলল–'জি, আধা তৈরি হয়েছে, আধা তৈরি হচ্ছে।'

খড়্গা বলল–'তিনজন অতিথি আসবে। তারা সকলে এলে প্রথম দফা শিককাবাব দিয়ে যাবে, এক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় দফা দেবে। যাও।'

রতন সিং-এর মুখ দেখে নিঃসংশয়ে কিছু বোঝা যায় না; তবু সন্দেহ হয়, মালিকের অতিথিদের সে পছন্দ করে না। সে রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে আবার শিককাবাব রচনায় মন দিল। মালিক যা করেন। তাই অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হয়, কিন্তু জুয়া খেলে টাকা ওড়ানো ভাল কাজ নয়। দেশ থেকে প্রতিমাসে এক হাজার টাকা আসে, অথচ মাসের শেষে এক পয়সাও বাঁচে না।

বাইরের ঘরে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে খড়্গা বাহাদুর ভাবছিল—আজ যদি হেরে যাই, রক্তদর্শন করব।

গত কয়েকবার সে ক্রমাগত হেরে আসছে।

আটটার সময় একে একে তিনটি অতিথি এল। তিনজনেই যুবক, সাজপোশাক দেখে বোঝা যায়, তিনজনেই বড়মানুষের ছেলে। একজন সিন্ধী, দ্বিতীয়টি পাঞ্জাবী, তৃতীয়টি পার্সী।

সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণের পর সকলে টেবিল ঘিরে বসল। রতন সিং চারটি প্লেটে প্রায় সেরখানেক শিককাবাব এনে রাখল; সঙ্গে রাই-বাটা এবং ছুরি-কাঁটা।

কথাবার্তা বেশি হল না, চারজন প্লেট টেনে নিয়ে ছুরি-কাঁটার সাহায্যে খেতে আরম্ভ করল। রতন সিং-এর শিককাবাব অতি উপাদেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারটি প্লেট শূন্য হয়ে গেল। সকলে রুমালে মুখ মুছে সিগারেট ধরাল। পাসী যুবকও সিগারেট খায়, আধুনিক যুবকেরা ধর্মের নিষেধ মানে না।

তারপর সাড়ে আটটার সময় তাসের নতুন প্যাক খুলে খেলা আরম্ভ হল। তিন তাসের খেলা, জোকার নেই। নিম্নতম বাজি পাঁচ টাকা, ঊর্ধ্বতম বাজি কুড়ি টাকা।

চারজনই পাকা খেলোয়াড়। কিন্তু রানিং ফ্লাশ খেলায় ক্রীড়ানৈপুণ্যের বিশেষ অবকাশ নেই, ভাগ্যই বলবান। কদাচিৎ ব্লাফ দিয়ে দু'এক দান জেতা যায়। আসলে হাতের জোরের ওপরেই খেলার হার-জিত।

সাড়ে দশটার সময় আর এক দফা শিককাবাব এল। এবার মাত্রা কিছু কম। সঙ্গে কফি। পনেরো মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করে আবার নতুন তাসের প্যাক খুলে খেলা আরম্ভ হল।

খেলা শেষ হল রাত্রি সাড়ে বারোটার সময়। হিসেবনিকেশ করে দেখা গেল, অতিথিরা তিনজনেই জিতেছে, খড়্গা বাহাদুর হেরেছে প্রায় সাত শো টাকা!

অতিথিরা হাসিমুখে সহানুভূতি জানিয়ে চলে গেল! খড়্গা বাহাদুর অন্ধকার মুখে অনেকক্ষণ একলা টেবিলের সামনে বসে রইল, তারপর হঠাৎ উঠে শোবার ঘরে গেল। বেশ পরিবর্তন করে মাথায় একটা কাউ-বয় টুপি পরে বেরিয়ে এল। রতন সিংকে বলল—'আমি বেরুচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি, তুমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জেগে থাকবে।'

রতন সিং বলল–'জি।'

খড়্গা বাহাদুর বেরিয়ে গেল। রতন সিং-এর মঙ্গোলীয় মুখ নির্বিকার রইল বটে, কিন্তু তার ছোট ছোট চোখ দু'টি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মালিক আজও হেরেছেন। তাঁস খেলায় হেরে মালিক কোথায় যান? ফিরে আসেন। সেই শেষ রাত্রে। কখনও আটটার আগেই বেরিয়ে যান, ফিরতে রাত হয়। কোথায় থাকেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান? কিংবা—

আর একটি রাত্রির কথা :

কপিলের বাড়িতে নৈশ আহার শেষ হয়েছিল। কর্তা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, কপিলের ছোট দুই ভাইবোনও নিজের নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। ড্রয়িংরুমে এসে বসেছিল কপিল, তার দাদা আর বউদিদি এবং তার দিদি ও জামাইবাবু। কর্তা বিপত্নীক, পুত্রবধূই বাড়ির গিন্নি। মেয়ে-জামাই দার্জিলিঙে থাকে, জামাইয়ের চায়ের বাগান আছে; আজ সকালে কয়েক দিনের জন্যে তারা কলকাতায় এসেছে।

কপিলদের বাড়িটা তিনতলা। নীচের তলায় একটা বড় ব্যাঙ্কের শাখা, উপরের দু'টি তলায় কপিলেরা থাকে। সবার উপরে প্রশস্ত খোলা ছাদ।

ড্রয়িং রুমে যাঁরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কপিলের দাদা গৌতমদেব বয়সে বড়। পৈতৃক সলিসিটার অফিসের তিনি এখন কর্তা। অত্যন্ত নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক; বাড়িতে কারুর সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাঁর স্ত্রী রমলার প্রকৃতি কিন্তু অন্যরকম। তার বয়স ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মে নিপুণা, সংসারের কোনো ব্যাপারেই নির্লিপ্ত নয়। উপরন্তু তার বুদ্ধিতে একটু অম্লরস মেশানো আছে, যার ফলে সকলেই তার কাছে একটু সতর্ক হয়ে থাকে।

কপিলের দিদি অশোকার বয়সও আন্দাজ ত্রিশ। তার সাত বছরের একটিমাত্র ছেলে স্কুলের বোর্ডি-এ থাকে। অশোকার চরিত্র সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে বড়মানুষের মেয়ে, বড়মানুষের বউ। পৃথিবীর অধিকাংশ জীবকেই সে করুণার চক্ষে দেখে, কারুর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলে না। তার স্বামী শৈলেনবাবু কিন্তু মজলিসী লোক;

আসার জমিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন, তর্ক করার দিকে ঝোঁক আছে এবং সুযোগ পেলে অযাচিত উপদেশও দিয়ে থাকেন।

তিনি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত একটি পাইপের মুণ্ড মুঠিতে ধরে ধূমপান করছেন। গৌতমদেব একটি মোটা সিগারেট ধরিয়েছেন। কপিলের নাকে তামাকের সুগন্ধ ধোঁয়া আসছে; কিন্তু সে গুরুজনদের সামনে ধূমপান করে না, তাই নীরবে বসে উসখুসি করছে। বাড়ির নিয়ম, নৈশাহারের পর সকলে অন্তত পনেরো মিনিটের জন্যে একত্র হবে। আগে কিতাও এসে বসতেন; এখন তাঁর বয়স বেড়েছে, খাওয়ার পরই শুয়ে পড়েন। বাড়ির অন্য সকলের জন্য কিন্তু নিয়ম জারি আছে।

জামাই শৈলেনবাবু পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কপিলকে নিরীক্ষণ করছিলেন, গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন–'কপিল, তুমি কি নাম-মাহাত্ম্যে সাধু সন্নিসি হয়ে যাবার মতলব করেছ?'

কপিল সমান গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিলে–'আপাতত সে রকম কোনো মতলব নেই।'

শৈলেনবাবু, বললেন—'তবে বিয়ে করছ না কেন? সংসার-ধর্ম করতে গেলে বিয়ে করা দরকার। তোমার বিয়ে করার উপযোগী বুদ্ধি না থাকতে পারে। কিন্তু বয়স তো হয়েছে।'

কপিল ভ্রূ একটু তুলে বলল–'বিয়ে করার জন্যে কি খুব বেশি বুদ্ধি দরকার?'

রমলা হেসে উঠল। কপিল ও শৈলেনবাবুর মধ্যে গভীর্য ঢাকা গূঢ় পরিহাসের সঙ্গে বাড়ির সকলেই পরিচিত। রমলা বলল–'বিয়ে করার জন্যে যদি বেশি বুদ্ধির দরকার হত তাহলে বাংলাদেশে কারুর বিয়ে হত না। আসলে ঠিক উলটো। ঠাকুরপোর বড় বেশি বুদ্ধি, তাই বিয়ে হচ্ছে না।'

'তাই নাকি!' শৈলেনবাবু অবিশ্বাস-ভরা চক্ষু বিস্ফারিত করে কপিলের পানে চাইলেন—'এত বুদ্ধি কপিলের! কিন্তু আর একটু পরিষ্কার করে না বললে কথাটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।'

রমলা বলল–'ওকেই জিজ্ঞেস করুন না। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই, তবুও বিয়ে করে না। কেন?'

শৈলেনবাবু প্রতিধ্বনি করলেন–'কেন?'

কপিল পকেটে হাত দিল, সিগারেটের কেস হাতে ঠেকাল, কেসটা অজ্ঞাতসারে বার করে আবার সে পকেটে রেখে দিল।

গৌতমদেব উঠে পড়লেন—'আমি উঠলাম, কাল ভোরেই আবার আমাকে–' কথা অসমাপ্ত রেখে তিনি প্রস্থান করলেন। নিজের উপস্থিতি দ্বারা কারুর অসুবিধা ঘটাতে তিনি চান না।

কপিল জামাইবাবুকে লক্ষ্য করে বলল–'বিয়ে করা একটা সিরিয়াস কাজ এ কথা। আপনি মানেন?'

শৈলেনবাবু নিজের গৃহিণীর প্রতি অপোঙ্গ দৃষ্টিপাত করে বললেন—'মানি বইকি। খুব সিরিয়াস কাজ।'

অশোকা সূক্ষ্ম হাস্যরস বোঝে না, কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা বললে যত সূক্ষ্ম খোঁচাই হোক ঠিক বুঝতে পারে। সে স্বামীর দিকে বিরক্তিসূচক কটাক্ষ হেনে বলল–'আমি শুতে চললুম। বাজে কথার কাচকচি শুনতে ভাল লাগে না।'

অশোকা চলে যাবার পর কপিল পকেট থেকে সিগারেট বার করে রমলাকে বলল–'বিউদি, সিগারেট খেতে পারি।'

রমলা বলল–'আহা, ন্যাকামি দেখে বাঁচি না। আমার সামনে যেন সিগারেট খাও না!'

কপিল বলল—'খাই, কিন্তু অনুমতি নিয়ে খাই।'

রমলা বলল–'আচ্ছা, অনুমতি দিলুম, খাও।'

কপিল সিগারেট ধরাল। তারপর শালা-ভগিনীপতির তর্ক আবার আরম্ভ হয়ে গেল। রমলা ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাসি নিয়ে শুনতে লাগল।

কপিল বলল–’বিয়ে করা যখন সিরিয়াস ব্যাপার তখন খুব বিবেচনা করে বিয়ে করা উচিত।’

শৈলেনবাবু বললেন—’অবশ্য, অবশ্য। কিন্তু কী বিবেচনা করবে?’

‘বিবেচনা করতে হবে, আমি কি চাই।’

‘কী চাও তুমি? রূপ? গুণ? বিদ্যা? বুদ্ধি?’

‘রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি থাকে ভাল, না থাকলেও আপত্তি নেই। আসলে চাই-মিনের মিল।’

‘হুঁ, মনের মিল। কিন্তু বিয়ে না হলে বুঝবে কি করে মনের মিল হবে কিনা।’

‘ওইখানেই তো সমস্যা। তবে আজকাল স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে মেয়েদের মন বুঝতে বেশি দেরি হয় না।’

রমলা বলল—’তুমি তাহলে মেয়েদের মন বুঝে নিয়েছ?’

কপিল বলল—’তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু বুঝলেই যে পছন্দ হবে তার কোনো মানে নেই।’

রমলা বলল–'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

শৈলেনবাবু বললেন–তাহলে যতদিন মনের মত মন না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন অনুসন্ধান চলবে?'

কপিল মুচকি হাসল, উত্তর দিল না।

শৈলেনবাবু সন্দিগ্ধস্বরে বললেন—'আসল কথাটা কি? ডুবে ডুবে জল খোচ্ছ না তো?'

'তার মানে?'

'মানে কোনো সধবা কিংবা বিধবা যুবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়নি তো?'

কপিল চকিত চোখে চাইল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, বলল–'বউদি, জামাইবাবুর মাথা গরম হয়েছে। ঠাণ্ডা দেশ থেকে গরম দেশে এসেছেন, হবারই কথা। তুমি ওঁর জন্যে আইস-ব্যাগের ব্যবস্থা কর, আমি শুতে চললাম।'

হাসি-মস্করার মধ্যে রাত্রির মত সভা ভঙ্গ হল। কপিল নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করল।

কপিলের ঘরটি বেশ বড়, লম্বাটে ধরনের। এক পাশে খাট-বিছানা, অন্য পাশে টেবিল-চেয়ার। কাচে ঢাকা টেবিলের ওপর কাচের নীচে আকাশের একটি মানচিত্র; নীল জমির ওপর সাদা নক্ষত্রপুঞ্জ ফুটে আছে। কপিল রাত্রিবাস পরল, ঢিলা পা-জামা আর হাত-কটা ফতুয়া। তারপর একটা বই নিয়ে টেবিলের সামনে পড়তে বসল।

ইংরেজি গণিত জ্যোতিষের বই, লেখকের নাম ফ্রেড় হয়েল। পড়তে পড়তে কপিল ঘড়ি দেখছে, আবার পড়ছে। বিশ্ব-রহস্য উদঘাটক জ্যোতিষগ্রন্থের প্রতি তার গভীর অনুরাগ; কিন্তু আজ তার মন ঠিক বইয়ের মধ্যে নেই, যেন সে সময় কাটাবার জন্যেই বই পড়ছে।

কব্জির ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজল। কপিল বই বন্ধ করে উঠল, দেয়ালের একটা আলমারির কপাট খুলে একটি দূরবীন যন্ত্র বার করল। যন্ত্রটি আকারে দীর্ঘ নয়, কিন্তু তিন পায়ার ওপর ক্যামেরার মত দাঁড় করানো যায়, আবার ইচ্ছামত পায়া গুটিয়ে নেওয়া যায়। কপিল দূরবীনটি বগলে নিয়ে ঘরের আলো নেবালো, তারপর সন্তর্পণে বাইরে এল।

ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গেলেই ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। কপিল পা টিপে টিপে সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত গিয়েছে এমন সময় সামনের একটা দরজা খুলে রমলা বেরিয়ে এল। তার মুখে খরশান ব্যঙ্গের হাসি। কপিল তাকে দেখে থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রমলা বলল–'কী ঠাকুরপো, এত রাত্রে দূরবীন নিয়ে কোথায় চলেছ?'

কপিল চাপা গলায় বলল—'আস্তে বউদি, বাবার ঘুম ভেঙে যাবে।'

রমলা গলা নীচু করল–'তোমার মতলব ভাল ঠেকছে না ঠাকুরপো।'

কপিল বলল–'কি মুশকিল। আমি তো প্রায়ই আকাশের তারা দেখবার জন্যে ছাদে উঠি। তুমি জান না?'

রমলা বলল—'জানি। কিন্তু সে তো সন্ধ্যের পর। আজ রাত দুপুরে কোন তারা দেখবে বলে ছাদে উঠছ?'

কপিল বলল–'আজ রাত্রি পৌঁনে বারোটার সময় মঙ্গলগ্রহ ঠিক মাথার ওপর উঠবে। মঙ্গলগ্রহ এখন পৃথিবীর খুব কাছে এসেছে, তাই তাকে ভাল করে দেখবার জন্যে ছাদে যাচ্ছি।'

রমলা মুখ গভীর করে বলল—'হুঁ, মঙ্গলগ্রহ। কোন গ্রহ-তারা তোমার ঘাড়ে চেপেছে তুমিই জান। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমাদের বাড়ির চার পাশে যাদের বাড়ি তারা গরমের সময় জানলা খুলে শুয়েছে, তুমি যেন তাদের জানলা দিয়ে গ্রহ-তারা দেখতে যেও না।'

কপিল মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে হাসল, বলল–'বউদি, তোমার মনটা ভারি সন্দিগ্ধ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোওনি কেন?'

রমলা বলল–'তোমার দাদা বিছানায় শুয়ে আইনের বই পড়ছেন, হঠাৎ তাঁর কফি খাবার শখ হল। তাই কফি তৈরি করতে চলেছি। তুমি খাবে?

'আমার সময় নেই।' কপিল চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

হয়তো মঙ্গলগ্রহই দেখবে।

আর একটি রাত্রির কথা :

সিনেমার শিল্পক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা সাধারণত দল বেঁধে থাকে, নিজেদের শিল্পীগোষ্ঠী নিয়ে একটা সমাজ তৈরি করে নিয়েছে, বাইরের লোকের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখে না। সুজন মিত্র কিন্তু দলে থেকেও ঠিক দলের পাখি নয়। যতক্ষণ সে স্টুডিওর সীমানার মধ্যে থাকে ততক্ষণ সকল শ্রেণীর সহকর্মী ও সহকর্মিণীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। তরুণী অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই এই সুদর্শন নবেদিত অভিনেতাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সুজন কারুর কাছে ধরা দেয়নি। পাঁকাল মাছের মত হাত পিছলে বেরিয়ে যাবার কৌশল তার জানা ছিল।

সিনেমার গণ্ডীর বাইরে তার প্রধান বন্ধুগোষ্ঠী ছিল নৃপতির আড়ার ছেলেরা; এখানে এসে সে যেন সমভূমিতে পদার্পণ করত। তার বংশপরিচয় কেউ জানে না, তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী

কেউ আছে কিনা সে পরিচয়ও কেউ কোনো দিন পায়নি, কিন্তু তার বন্ধু-নির্বাচন থেকে অনুমান করা যায় যে তার বংশপরিচয় যেমনই হোক, সে নিজে উচ্চ-মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিত মার্জিত চরিত্রের মানুষ।

একদিন স্টুডিওতে তার শুটিং ছিল, কাজ শেষ হতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে মুখের রঙ পরিষ্কার করে বেরুতে আরো ঘণ্টাখানেক কাটল। সুজনের একটি ছোট মোটর আছে, তাইতে চড়ে সে যখন স্টুডিও থেকে বেরুল তখন রাত্রি হয়ে গেছে।

মাইল দেড়েক চলাবার পর মোটর একটি হোটেলের সামনে এসে থামল। সুজন হোটেলেই। খায়। তার বাসায় রান্নার আয়োজন নেই। কিন্তু রোজ একই হোটেলে খায় না। যখন যা খাবার ইচ্ছে হয় তখন সেই রকম হোটেলে যায়, কখনো বা মিষ্টান্নের দোকানে গিয়ে দই-সন্দেশ খেয়ে পেট ভরায়। যেদিন শুটিং থাকে সেদিন দুপুরে স্টুডিওর ক্যান্টিনে খায়।

হোটেলের পাশে গাড়ি পার্ক করে সে যখন হোটেলে ঢুকাল তখন তার নাকের নীচে একজোড়া শৌখিন গোঁফ শোভা পাচ্ছে। গোঁফ জোড়া অকৃত্রিম নয়, সুজন কোনো প্রকাশ্য স্থানে গেলেই মুখে গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশ পরিধান করে। তার মুখখানা সিনেমার প্রসাদে জনসাধারণের খুবই পরিচিত, তাকে সশরীরে দেখলে সিনেমা-পাগল লোকেরা বিরক্ত করবে। এই আশঙ্কাতেই হয়তো সে গোঁফের আড়ালে স্বরূপ লুকিয়ে রাখে।

হোটেলে আহার শেষ করে সুজন মোটর চালিয়ে নিজের বাসার দিকে চলল। বাসাটি পাড়ার এক প্রান্তে একটি সরু রাস্তার ওপর; ছোট বাড়ি কিন্তু গাড়ি রাখার আস্তাবল আছে।

গ্যারেজে গাড়ি রেখে সুজন চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকল, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। একসঙ্গে গোটা তিনেক দ্যুতিমান বালব জ্বলে উঠল।

চৌকশ ঘরটি বেশ বড়। তাতে খাট-বিছানা আছে, টেবিল-চেয়ার আলমারি আছে, এমন কি স্টোভি, চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতিও আছে। মনে হয়, সুজন এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণ সঞ্চয় করে রেখেছে।

একটি লম্বা আরাম-কেদারায় অঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে সে পকেট থেকে সিগারেট বার করল, সিগারেট ধরিয়ে পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল একটা বালবের দিকে দৃষ্টি রেখে মৃদ-মন্দ টান দিতে লাগল। এখন আর তার মুখে গোঁফ নেই, নগ্ন মুখখান ছুরির মত ধরাল।

সিগারেট শেষ করে সুজন কব্জির ঘড়ি দেখল-নাটা বেজে কুড়ি মিনিট। সে উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল; সাড়ে ছফুট উঁচু আয়নায় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের দেহ মুখ পরীক্ষা করল; একবার হাসল, একবার ভ্রূকুটি করল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে আলমারির কাছে গেল।

আলমারি থেকে সে দু'টি জিনিস বার করল; একটি হুইস্কির বোতল এবং বড় চৌকো। আকারের একটি পুরু। লাল কাগজের খাম। প্রথমে সে গেলাসে ছোট পেগ মাপের হুইস্কি ঢেলে তাতে জল মেশালো, তারপর গেলাস আর খাম নিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল। গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে চেয়ারের হাতার ওপর রেখে আগফার খাম থেকে একটি ফটো বার করল।

ক্যাবিনেট আয়তনের ফটো, একটি যুবতীর আ-কটি প্রতিকৃতি, যুবতী হাসি-হাসি মুখে দর্শকের পানে চেয়ে আছে। মনে হয়, সে সিনেমার অভিনেত্রী নয়, মুখে বা দেহভঙ্গীতে কৃত্রিমতা নেই। কিন্তু সে কুমারী কি বিবাহিতা, ফটো থেকে বোঝা যায় না।

সুজন থেকে থেকে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ছবিটি দেখতে লাগল। চোখে তার প্রগাঢ় তন্ময়ত, পলকের তরেও ছবি থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এক ঘণ্টা কেটে গেল, গোলাসের পানীয় নিঃশেষ হল; কিন্তু সুজনের চিত্রদর্শন-পিপাসা মিটাল না। সে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সিগারেট ধরল। তার ঠোঁট নড়তে লাগল, যেন চুপি চুপি ছবির সঙ্গে কথা কইছে। তারপর ছবিটি নিজের গালের ওপর চেপে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

পৌঁনে এগারোটার সময় সে ছবিটি আবার খামে পুরে আলমারিতে তুলে রাখল, আয়নার সামনে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আলো নিবিয়ে আবার বাড়ি থেকে বেরুল। মোটর নিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা দক্ষিণ কলকাতার নগরগুঞ্জনক্ষান্ত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে শেষে রবীন্দ্র সরোবরের ঘেরার মধ্যে রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর গাড়ি

দাঁড় করল। গাড়ি থেকে যখন নামল, দেখা গেল নকল গোঁফ তার নাকের নীচে ফিরে এসেছে। গাড়ি লক করে সে লেক থেকে বেরুল, বড় রাস্তা পার হয়ে একটা সরু রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

রাস্তার দু’ পাশে বাড়ির আলো নিবে গেছে। সুজন একটি ল্যাম্প-পোস্টের নীচে এসে দাঁড়াল। রাস্তার ওপারে একটা বাড়ি, তার দোতলার একটা জানলা দিয়ে নৈশদীপের অস্ফুট আলো আসছে। সুজন সেই দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে ল্যাম্প-পেস্টের তলায় দাঁড়িয়ে রইল। ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়ালে মাথার ওপর আলো পড়ে, মানুষটাকে দেখা যায় বটে, কিন্তু মুখ চেনা যায় না।

কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও জানলায় কাউকে দেখা গেল না। সুজন যাকে চোখের দেখা দেখতে চায় সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা অন্য একজনের বাহুবন্ধনের মধ্যে শুয়ে জেগে আছে।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম। সুজন আগুনের হালকার মত তপ্ত নিশ্বাস ফেলল, তারপর ফিরে চলল।

আর একটি রাত্রির কথা :

দেবাশিস আর দীপা একসঙ্গে টেবিলে বসে রাত্রির আহার সম্পন্ন করল। নকুলকে শুনিয়ে দীপা বাগানের কথা বলল; মালী পদ্মলোচন বুগেনভিলিয়া লতাকে বাইগনবিল্লি

বলে শুনে দেবাশিস খানিকটা হাসল, তারপর ফ্যাক্টরির একটা মজার ঘটনা বলল। বাইরের ঠাট বজায় রইল। খাওয়া শেষ হলে দু'জনে ওপরে গিয়ে নিজের নিজের ঘরে ঢুকল। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করতে তারা বেশ অভ্যস্ত হয়েছে; কিন্তু যখন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকে না, যখন অভিনয় করার দরকার নেই, তখনই বিপদ।

দীপা ঘরে গিয়ে নৈশদীপ জ্বেলে খানিকক্ষণ খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আজ বাইরে হাওয়া নেই, গ্রীষ্মের রাত্রি যেন নিশ্বাস রোধ করে আছে। দীপা পাখা চালিয়ে দিয়ে ব্লাউজ খুলে শুয়ে পড়ল। ঘুম কখন আসবে তার ঠিক নেই। কিন্তু যথাসময়ে বিছানায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর তো কোনো কাজও নেই। শুয়ে শুয়ে সে মাথার মধ্যে দেবাশিসের একটা কথা প্রতিধ্বনির মত শুনতে লাগল-দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

দেবাশিস নিজের ঘরে খাটের পাশে পড়ার আলো জ্বেলে একখানা ইংরেজি বিজ্ঞানের বই নিয়ে শুয়েছিল। তার গায়ে জামা নেই, পাখাটা ছাদ থেকে বনবান করে ঘুরছে। দেবাশিস বইয়ে মন বসাতে পারছিল না, মনটা যেন তপ্ত বাষ্প হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাথায় ঠাণ্ডা জল থাবড়ে দিয়েও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। আধা ঘণ্টা পরে সে বই রেখে আলো নিবিয়ে দিল। উজ্জ্বল আলোটাই যেন ঘরের বাতাসকে আরো গরম করে তুলেছে।

অন্ধকার ঘরে দেবাশিস চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে। পাখার হাওয়া সত্ত্বেও বিছানাটা যেন রুটি-সেঁকা তাওয়ার মত তপ্ত। এ-পাশ ও-পাশ করেও নিষ্কৃতি নেই, বালিশের ওপর মাথাটা গরম হয়ে উঠছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনও গরম হচ্ছে, কিন্তু সেটা অগোচরে। শেষে হঠাৎ গভীর রাত্রে এই মানসিক উত্মা মাটি ফুড়ে আগ্নেয়গিরির মত উৎসারিত হল। দেবাশিস ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চাপা গর্জনে বলল–'Goddamn it, she is my wife!'

অন্ধকারে দেবাশিস কিছুক্ষণ স্নায়ুপেশী শক্ত করে বসে রইল, তারপর বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরুল। বসবার ঘরের আলো জ্বালতেই সুইচে কটাস করে শব্দ হল, মনে হল ঘরটা যেন চমকে উঠল। দেবাশিসও একটু চমকালো, হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আলোর দীপ্তি চোখে আঘাত করল। সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে দীপার বন্ধ দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজায় খিল দেওয়া কি শুধুই ভেজানো, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। হয়তো একটু ঠেললেই খুলে যাবে। দীপা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবাশিস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় টোকা দেবার জন্যে হাত তুলল, ঘুমন্ত দীপার ঘরে অনাহূত দোর ঠেলে প্রবেশ করতে পারল না। তারপর টোকা দিতেও পারল না, তার উদ্যত হাত নেমে পড়ল। 'কাপুরুষ!' মনের গভীরে নিজেকে কঠোর ধিক্কার দিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

দীপা তখনো ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল। কিন্তু সে কিছু জানতে পারল না।

০৭. বিয়ের পর দু’মাস কেটে গেল

দেবাশিস আর দীপার বিয়ের পর দু'মাস কেটে গেল। যেদিনের ঘটনা নিয়ে কাহিনী আরম্ভ হয়েছিল, সেই যেদিন দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দীপকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দীপা যায়নি, দীর্ঘ পশ্চাদ্দৃষ্টির পর আমরা সেইখানে ফিরে এলাম।

দেবাশিস পায়ে হেঁটে নৃপতির বাড়ির দিকে যেতে যেতে মাঝ-রাস্তায় থমকে দাঁড়াল। তার মনটা তিক্ত হয়েই ছিল, এখন নৃপতির বাড়িতে গিয়ে হালকা ঠাট্টা-তামাশা উদ্দেশ্যহীন গল্পগুজব করতে হবে, প্রবালের পিয়ানো বাজনা শুনতে হবে ভাবতেই তার মন বিমুখ হয়ে উঠল। অনেক দিন পড়াশুনো করা হয়নি, অথচ তার যে কাজ তাতে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে পৃথিবীর কোথায় কি কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। তার কাছে কয়েকটা বিলিতি বিজ্ঞান-পত্রিকা নিয়মিত আসে, কিন্তু গত দু’মাস তাদের মোড়ক পর্যন্ত খোলা হয়নি। দেবাশিস আবার বাড়ি ফিরে চলল। আজ আর আড্ডা নয়, আগের মত সন্ধ্যেটা পড়াশুনো করেই কাটাকে।

দীপা রেডিও চালিয়ে দিয়ে চোখ বুজে। আরাম-চেয়ারে বসে ছিল, দেবাশিসকে ফিরে আসতে দেখে রেডিও বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, উদ্বিগ্ন প্রশ্নভরা চোখে তার পানে চাইল।

দেবাশিস যথাসম্ভব সহজ গলায় বলল—'ফিরে এলাম। অনেক দিন পড়াশুনো হয়নি, আজ একটু পড়ব।'

টেলিফোন টেবিলের নীচের থাকে বিলিতি পত্রিকাগুলো জমা হয়েছিল দেবাশিস সেগুলো নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল; সেখানে পত্রিকার মোড়ক খুলে তারিখ অনুযায়ী সাজাল, তারপর বিছানায় শুয়ে পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

ওঘরে দীপা আস্তে আস্তে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা দ্রুত নিবিড় হয়ে আসছে। পদ্মলোচন বাগানে জল দিচ্ছে। আজ দীপা বাগানে যায়নি। বিকেলবেলা সে সিনেমায় যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর দেবাশিস আহত লাঞ্ছিত মুখে চলে গেল, দীপার মনটাও কেমন একরকম হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে তার জীবনটা এমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে যে, মনে হয় কোনো দিনই এ জট ছাড়ানো যাবে না। মনের মধ্যে একটা নতুন সমস্যা জন্ম নিয়েছে, তার কোনো সমাধান নেই।

বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে, পদ্মলোচন বাগানের কাজ শেষ করে চলে গেল। দীপা তখন জানলা থেকে ফিরে নিঃশব্দে দেবাশিসের ঘরের দিকে গেল। দেবাশিস তখন আলো জ্বেলেছে, বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়ে পড়ায় নিমগ্ন। দীপা কিছুক্ষণ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকাল; কিন্তু দেবাশিস তাকে দেখতে পেল না। দীপা তখন একেবারে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাশিস চমকে চোখ তুলল।

দীপা বলল–'চা খাবে?'

দেবাশিস একটু হাসল। দীপা বিকেলবেলার রূঢ়তার জন্যে অনুতপ্ত হয়েছে। সে বলল—’তুমি যদি খাও আমিও খাব।’

‘এক্ষুনি আনছি।’ দীপা হরিণীর মত ছুটে চলে গেল। দেবাশিস কিছুক্ষণ দোরের দিকে চেয়ে থেকে আবার পড়ায় মন দিল।

দীপ রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, নকুল রান্না চড়িয়েছে। সে বলল—’নকুল, তুমি সরো, আমি চা তৈরি করব।

নকুল বলল—’চা তৈরি করবে? দাদাবাবু খাবেন বুঝি? তা তুমি কেন করবে বউদি, আমি করে দিচ্ছি।’

‘না, আমি করব। তুমি সরো।’

নকুল মনে মনে খুশি হল—’আচ্ছা বউদি, তুমিই কর।’

নকুলের ছায়াচ্ছন্ন মন অনেকটা পরিষ্কার হল। এই দু’মাস দেখেশুনে তার ধারণা জন্মেছিল, গোড়াতে কোনো কারণে এদের মনের মিল হয়নি, এখন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসছে। ঘি আর আগুন। একসঙ্গে কত দিন ঠাণ্ডা থাকবে!

দীপা চা তৈরি করে ট্রে-র ওপর টি-পাট, দু'টি পেয়ালা প্রভৃতি বসিয়ে ওপরে উঠে গেল, বসবার ঘরে ট্রে রেখে দেবাশিসের দোরের কাছে এসে বলল–'চা এনেছি।'

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ উঠে এসে চায়ের টেবিলে বসিল। দীপা চা পেয়ালায় ঢেলে একটি পেয়ালা দেবাশিসের দিকে এগিয়ে দিল, নিজের পেয়ালাটি হাতে তুলতে গিয়ে খানিকটা চা চলকে পিরিচে পড়ল।

আজ দেবাশিস হঠাৎ ফিরে আসার পর দীপার শরীরটাও যেন শাসনের বাইরে চলে গেছে। থেকে থেকে বুকের মধ্যে আনচান করে উঠছে, মাথার মধ্যে যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কান্নায় গলা বুজে আসছে। সে কাঁদুনে মেয়ে নয়, এত দিনের দীর্ঘ পরীক্ষায় সে পরম দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে আজ তার এ কী হ'ল?

এক চুমুক চা খেয়ে দেবাশিস বলল—'আঃ! খাসা চা হয়েছে। কে করল-নকুল?'

'না—আমি।' দীপার গলাটা কেঁপে গেল, মনে হল শরীরের অস্থিমাংস নরম হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল।

দেবাশিস আর কিছু বলল না, কেবল একটু প্রশংসাসূচক হাসল। দীপা দু' চুমুক চা খেয়ে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিল, তারপর যেন গুনে গুনে কথা বলছে এমনিভাবে বলল—'কাল তুমি আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে?'

দেবাশিস চকিত চোখে তার পানে চাইল, ক্ষণেক নীরব থেকে বলল–'তোমার যদি ইচ্ছে না। থাকে, আমার মন রাখার জন্যে সিনেমা দেখার দরকার নেই।'

'না, আমি দেখতে চাই।' চায়ের পেয়ালা শেষ করে দেবাশিস উঠে দাঁড়াল–'বেশ, তাহলে নিয়ে যাব।' দেবাশিস নিজের ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বাজল।

দীপার বুক আশঙ্কায় ধকধক করে উঠল। কার টেলিফোন!

দেবাশিস গিয়ে টেলিফোন ধরল–'হ্যালো।'

অন্য দিক থেকে কে কথা বলছে, কী কথা বলছে, দীপা শুনতে পেল না, কেবল দেবাশিসের কথা একাগ্র হয়ে শুনতে লাগল, '৩...কী খবর?...না, আজ বাড়িতেই আছি...না, শরীর ভাল আছে...এখন?...ও বুঝেছি, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি...না না, কষ্ট কিসের...আচ্ছা—'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দেবাশিস কব্জির ঘড়ির দিকে তাকালো, আটটা বেজে গেছে। 'আমাকে একবার বেরুতে হবে। হেঁটেই যাব। আধা ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।'

সে বেরিয়ে গেল। দীপা কোনো প্রশ্ন করল না; সে জানতে পারল না, দেবাশিস কোথায় যাচ্ছে। একলা বসে বসে ভাবতে লাগল, কে দেবাশিসকে টেলিফোন করেছিল?

দেবাশিস আধা ঘণ্টার মধ্যে ফিরল না। তারপর আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। নকুল নীচে থেকে এসে বলল–'হ্যাঁ বউদি, দাদাবাবু কোথায় গেল? কখন ফিরবে?'

দীপা বলল—'তা তো জানি না নকুল। কোথায় গেছেন বলে যাননি, শুধু বললেন আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরবেন।'

নকুল বলল–'আধা ঘণ্টা তো কখন কেটে গেছে। খাবার সময় হল। কখনো তো এমন দেরি করে না।' নকুল চিন্তিতভাবে বিজবিজ করতে করতে নীচে নেমে গেল।

একজনের উদ্বেগ অন্যের মনে সঞ্চারিত হয়। দীপার মনও উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল; নানারকম বাস্তব-অবাস্তব সম্ভাবনা তার মাথার মধ্যে উকিঝুঁকি মারতে লাগল।

নটা বেজে পাঁচ মিনিটে টেলিফোন বেজে উঠতেই দীপা চমকে উঠে দাঁড়াল, ভয়ে ভয়ে গিয়ে টেলিফোন তুলে কানো ধরল, ক্ষীণস্বরে বলল—'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে স্বর এল–'আমি। গলা শুনে চিনতে পারছ?'

দীপার গলার আওয়াজ আরো ক্ষীণ হয়ে গেল–'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী বাড়িতে আছে?'

'না।'

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী কোনো গোলমাল করেনি?'

'না।'

'তুমি যেমন ছিলে তেমনি আছ?'

'হাঁ।'

'আমার নাম কাউকে বলনি?'

'না।'

'মা কালীর নামে দিব্যি করেছ, মনে আছে?'

'আছে।'

'আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। সাবধানে থেকে। আবার টেলিফোন করব।'

দীপার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, সে টেলিফোন রেখে আবার এসে বসল; মনে হল, তার দেহের সমস্ত প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে। দুহাতে মুখ ঢেকে সে চেয়ারে পড়ে রইল।

সাড়ে ন'টার সময় নকুল আকার এসে বলল—বউদি, দাদাবাবু এখনো এল না, আমার ভাল ঠেকছে না—'

এই সময় তৃতীয় বার টেলিফোন বাজল। দীপার মুখ সাদা হয়ে গেল; সে সমস্ত শরীর শক্ত করে উঠে গিয়ে ফোন ধরল। মেয়েলী গলার আওয়াজ শুনল–'হ্যালো, এটা কি দেবাশিস ভট্টের বাড়ি?'

দীপার বুক ধড়ফড় করে উঠল, সে কোনো মতে উচ্চারণ করল—'হ্যাঁ।'

'আপনি কি তাঁর স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

‘দেখুন, আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। আপনি একবার আসতে পারবেন?’

‘কেন? কী হয়েছে?’

‘ইয়ে-আপনার স্বামীর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। আপনি চট্ করে আসুন।’

দীপার মুখ থেকে বুক-ফাটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল—’বেঁচে আছেন?’

‘হ্যাঁ। এই কিছুক্ষণ আগে জ্ঞান হয়েছে।’

‘আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। কোন হাসপাতাল?’

‘রাসবিহারী হাসপাতাল, এমারজেন্সি ওয়ার্ড।’

ফোন রেখে দিয়ে দীপা ফিরল; দেখল, নকুল তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নকুল ব্যাকুল চোখে চেয়ে বলল–’বউদি?

নকুলের শঙ্কা-বিবশ মুখ দেখে দীপা হঠাৎ নিজের হৃদয়টাও দেখতে পেল। আজকের দীপা আর দু’ মাস আগের দীপা নেই, সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। তার মাথাটা একবার

ঘুরে উঠল। তারপর সে দৃঢ়ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'তোমার দাদাবাবুর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

নকুল আস্তে আস্তে মেঝের ওপর বসে পড়ল। দীপা বলল—'না নকুল, এ সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। চল, এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে।'

দীপা নকুলকে হাতে ধরে টেনে দাঁড় করালো।

০৮. ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু

অনুক্রম

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু যখন হাসপাতালে পৌঁছুলেন তখন রাত্রি দশটা। হাসপাতালের দর দালানে লোক কমে গেছে। এক পাশে এক বেঞ্চিতে একটি যুবতী শরীর শক্ত করে বসে। আছে, তার পায়ের কাছে জবুথবু হয়ে বসে আছে একটি বুড়ে চাকর। যুবতীর চোখে বিভীষিকাময় সম্ভাবনার আতঙ্ক।

একটি নার্স ব্যোমকেশকে দেখে এগিয়ে এল। রাখালবাবু বললেন—’থানা থেকে আসছি।’

‘আসুন।’ নার্স তাঁদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে বসাল। বলল—‘একটু বসুন, ডাক্তার গুপ্ত আপনাদেরই জন্য অপেক্ষা করছেন।’

নার্স চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার গুপ্ত এলেন। মধ্যবয়স্ক মধ্যমাকৃতি মানুষ, বিশ বছর ধরে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেও ক্লান্ত হননি, বরং প্রাণশক্তি আরো বেড়েছে। রাখালবাবু নিজের এবং ব্যোমকেশের পরিচয় দিলে ডাক্তার হেসে বললেন—’আরে মশাই, আজ দেখছি অসাধারণ ঘটনা ঘটার দিন। ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গেও পরিচয় হল। বসুন, বসুন।’

তিনজন বসলেন। রাখালবাবু বললেন—’ব্যাপার কি বলুন দেখি।’

ডাক্তার গুপ্ত বললেন–'আরো মশাই, আশ্চর্য ব্যাপার, অভাবনীয় ব্যাপার। আমি বিশ বছর। ডাক্তারি করছি, এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার দেখিনি। অবশ্য ডাক্তারি কেতবে দু-চারটে উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু স্বচক্ষে দেখা-কোটিকে গুটিক মিলে।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল–'রহস্য নিয়েই আমার কারবার, আপনি আমাকেও অবাক করে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, একটা মনের মত রহস্য এতদিনে পাওয়া গেছে। আপনি গোড়া থেকে সব কথা বলুন।'

ডাক্তার বললেন–'বেশ, তাই বলছি। আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তিনটি ছোকরা একজন অজ্ঞান লোককে ট্যাক্সিতে নিয়ে এখানে এল। তারা রবীন্দ্র সরোবরে বেড়াতে গিয়েছিল, দেখল একটা গাছের তলায় বেঞ্চির পাশে মানুষ পড়ে আছে। দেশলাই জ্বেলে মানুষটাকে দেখল, তার পিঠের বাঁ দিকে শজারুর কাঁটা বিঁধে আছে। লোকটা কিন্তু মরেনি, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ওদের মধ্যে একজন লোকটিকে চিনতে পারল, তাদের ফ্যাক্টরির মালিক দেবাশিস ভট্ট। তখন তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে এল।

'ছোকরাকে টেবিলে শুইয়ে পরীক্ষা করলাম। শজারুর কাঁটা দিয়ে হত্যা করার কথা সবাই জানে; আমি ভাবলাম এ ক্ষেত্রে কাঁটা বোধ হয়। হার্ট পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কিন্তু হার্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি–অবাক কাণ্ড। হার্ট নেই! তারপর বুকের ডান দিকে হার্ট খুঁজে পেলাম। প্রকৃতির খেয়ালে ছোকরা ডান দিকে হার্ট নিয়ে জন্মেছে।

'শজারুর কাঁটা হার্টকে বিধতে পারেনি বটে, কিন্তু বাঁ দিকের ফুসফুসে বিঁধেছে। সেটাও কম সিরিয়াস নয়। যতক্ষণ কাঁটা বিধে আছে, ততক্ষণ রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে না, কিন্তু কাঁটা বার করলেই ফুসফুসের মধ্যে রক্তপাত হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

'যাহোক, খুব সাবধানে পিঠ থেকে কাঁটা বার করলাম। ছ' ইঞ্চি লম্বা কাঁটা, তার দুইঞ্চি বাইরে বেরিয়ে ছিল, বাকিটা সোজা ফুসফুসের মধ্যে ঢুকেছিল। এই দেখুন সেই কাঁটা।'

ডাক্তার পকেট থেকে একটি শজারুর কাঁটা বার করে ব্যোমকেশের হাতে দিলেন। শজারুর কাঁটা অনেকেই দেখেছেন, সবিস্তারে বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এই কাঁটাটি নিরুনের মত সরু, কাচের কাঠির মত অনমনীয় এবং ডাক্তারি শল্যের মত তীক্ষ্ণগ্র। মারাত্মক অস্ত্রটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর হাতে দিল, বলল— 'তারপর বলুন।'

ডাক্তার বললেন–'কাঁটা বার করলাম। ছোকরার বরাত ভাল ফুসফুসের মধ্যে রক্তপাত হল না। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হল, নিজের ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে স্ত্রীর কাছে খবর পাঠাতে বলল। তারপর তাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ালাম। ওর স্ত্রী যখন এল তখন ও ঘুমুচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলল–'বাইরে একটি মেয়ে বসে আছে, সেই কি-?'

ডাক্তার বললেন-'হ্যাঁ, দেবাশিসের স্ত্রী। ও স্বামীর কাছে থাকতে চায়, কিন্তু এখন তো তা সম্ভব নয়। ওকে বললাম, বাড়ি ফিরে যাও; কিন্তু ও যাবে না।'

'ওকে স্বামীর কাছে যেতে দেওয়া হয়েছিল?'

'একবার ঘরে গিয়ে স্বামীকে দেখে এসেছে। আমরা আশ্বাস দিয়েছি, আশঙ্কার বিশেষ কারণ নেই, তুমি বাড়ি যাও, কাল সকালে আবার এস। কিন্তু ও কিছুতেই যাবে না।'

ব্যোমকেশ উঠবার উপক্রম করে বলল–'আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।'

ডাক্তার বললেন–বেশ তো, দেখুন না। কিন্তু একটা কথা। ওর স্বামীকে কেউ খুন করবার চেষ্টা করেছিল একথা ওকে বলা হয়নি, বলা হয়েছে অ্যাকসিডেন্টে বুকে চোট লেগেছে। আপনারাও তাই বলবেন। মেয়েটি এমনিতেই শক্ পেয়েছে, ওকথা শুনলে আরো বেশি শক পাবে।'

'না, বলব না।'

রাখালবাবু বললেন-'শজারুর কাঁটা আমি রাখলাম। এই নিয়ে চারটি হল।'

দীপা বেঞ্চির ওপর ঠিক আগের মতাই সোজা হয়ে বসে ছিল, ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু তার কাছে যেতেই সে উঠে দাঁড়াল। রাখালবাবু বললেন—'আমি পুলিসের লোক। ইনি শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।'

ব্যোমকেশের নাম দীপার মনে কোনো দাগ কাটল না। তার শঙ্কাভরা চোখ একবার এর মুখে একবার ওর মুখে যাতায়াত করতে লাগল।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলল–'আপনি ভয় পাবেন না। আপনার স্বামীর গুরুতর আঘাত লেগেছিল বটে, কিন্তু জীবনের আশঙ্কা আর নেই।'

দীপা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বোধ করি নিজেকে সংযত করল। তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল–'আমাকে ওঘরে থাকতে দিচ্ছে না কেন?'

ব্যোমকেশ বলল–'দেখুন, আপনার স্বামীকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, এ সময় আপনি তাঁর কাছে থেকে কী করবেন? তার চেয়ে–'

দীপা বলল–'না, আমাকে যদি ওর কাছে থাকতে না দেওয়া হয়, আমি সারা রাত্রি এখানে বসে থাকব।'

ব্যোমকেশ বলল–'কিন্তু রুগীর ঘরে ডাক্তার আর নার্স ছাড়া এসময় অন্য কারুর থাকা নিষেধ।'

দীপা বলল—'আমি কিছু করব না, খাটের একপাশে চুপটি করে বসে থাকব।'

ব্যোমকেশ আরো কিছুক্ষণ দীপাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে টলাতে পারল না। তখন সে মাথা চুলকে বলল—'আচ্ছা, ডাক্তারবাবুকে বলে দেখি। দেবাশিসবাবুর কি অন্য কোনো আত্মীয় এখানে নেই?'

'না, ওঁর অন্য কোনো আত্মীয় নেই।'

'আপনার নিশ্চয় আত্মীয়স্বজন আছেন। তাঁরা কোথায় থাকেন, তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে?'

দীপা বলল—'তাঁরা কাছেই থাকেন, কিন্তু তাঁদের খবর দিতে ভুল হয়ে গেছে।'

ব্যোমকেশ বলল–'ঠিকানা দিন, আমরা তাঁদের খবর দিচ্ছি।'

দীপা ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিল। ব্যোমকেশ তখন ডাক্তার গুপ্তর কাছে ফিরে গিয়ে বলল—'ডাক্তারবাবু, বউটিকে স্বামীর কাছে থাকতে দিন। ও বুদ্ধিমতী বলেই মনে হল, কিন্তু বড় ভয় পেয়েছে।'

ডাক্তারবাবু দু' একবার আপত্তি করলেন, স্ত্রীজাতি বড় ভাবপ্রবণ, আবেগের বশে যদি স্বামীকে আঁকড়ে ধরে, ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হলেন। ব্যোমকেশ দীপাকে ডেকে এনে যে ঘরে দেবাশিস ছিল সেই ঘরে নিয়ে গেল। দীপা পা টিপে টিপে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াল, সামনের দিকে ঝুকে ব্যগ্র চোখে দেবাশিসের মুখ দেখল। দেবাশিস পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, তার মুখের ভাব শান্ত প্রসন্ন। দীপা তার মুখের ওপর চোখ, রেখে অতি সন্তর্পণে খাটের পাশে বসল। একজন নার্সও সঙ্গে এসেছিল, সে ঠোঁটে আঙুল রেখে দীপাকে সতর্ক করে দিল।

রাত্রি এগারোটার সময় হাসপাতাল থেকে বেরুবার পথে রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে চাইলেন–'বউটির বাপের বাড়িতে টেলিফোন করতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল–'না, সশরীরে সেখানে উপস্থিত হওয়া দরকার। আজ রাত্রে তোমার বিশ্রাম নেই।'

রাখালবাবু বললেন–'আমি বিশ্রামের জন্যে ব্যস্ত নই।'

পুলিসের গাড়িতে দীপার বাপের বাড়িতে পৌঁছুঁতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। রাস্তা নিরালা, বাড়ির সদর দোর বন্ধ। রাখালবাবু সজোরে কড়া নাড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে বিজয় ঘুম-চোখে দরজা একটু ফাঁক করে বলল—'কে? কি চাই?'

রাখালবাবু বলল—'ভয় নেই, দোর খুলুন। আমরা পুলিসের লোক।'

ইতিমধ্যে নীলমাধব উপস্থিত হয়েছেন। বিজয় দোর খুলে দিল, রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ভিতরে এসে প্রশ্ন করলেন–'দেবাশিস ভট্ট আপনাদের কে?'

নীলমাধব বললেন—'আমার জামাই। কি হয়েছে?'

রাখালবাবু বললেন—'একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, আপনার জামাই বুকে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আছেন। আপনার মেয়েও খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছেন।'

নীলমাধব বললেন—'অ্যাঁ! কোন হাসপাতালে?'

'রাসবিহারী হাসপাতালে। ভয় পাবেন না আঘাত গুরুতর হলেও জীবনের আশঙ্কা নেই।'

'আমরা এখনি যাচ্ছি। বিজয়, তুমি এদের বসাও, আমি তোমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

তিনি ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। ব্যোমকেশ বিজয়কে প্রশ্ন করল—'দেবাশিসবাবু আপনার ভগিনীপতি?

'হ্যাঁ। আমিও হাসপাতালে যাব।'

'না আপনার সঙ্গে আমাদের একটু আলোচনা আছে।'

খানিক পরে নীলমাধব আধ-ঘোমটা টানা স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাখালবাবু বললেন—'আপনারা পুলিসের গাড়িতেই যান। গাড়ি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। ততক্ষণ আমরা এখানেই আছি।'

তাঁদের রওনা করে দিয়ে তিনজনে বৈঠকখানায় এসে বসলেন। ব্যোমকেশ বিজয়কে প্রশ্ন করল–'আপনার বোনের কত দিন বিয়ে হয়েছে?'

বিজয় বলল-'দু'মাসের কিছু বেশি।'

'আপনার ভগিনীপতি কি কাজ করেন?'

বিজয় 'প্রজাপতি প্রসাধন ফ্যাক্টরির কথা বলল।

'তাঁর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'যতদূর জানি, কেউ নেই!'

'বন্ধুবান্ধব?'

‘অন্য বন্ধুবান্ধবের কথা জানি না, কিন্তু নৃপতিদার আড্ডায় যারা যায়। তাদের সঙ্গে দেবাশিসের ঘনিষ্ঠতা আছে।’ নৃপতি লাহার আডার পরিচয় দিয়ে বিজয় বলল—’কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন?’

ব্যোমকেশ একবার রাখালবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বলল—’আপনাকে বলছি, আপনি উপস্থিত অন্য কাউকে বলবেন না, দেবাশিসবাবুকে কেউ খুন করবার চেষ্টা করেছিল।’

বিজয়ের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, সে উত্তেজিত হয়ে বলল–’আমি জানতাম।’

ব্যোমকেশের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—’কী জানতেন?

‘জানতাম যে, এই ঘটবে।’

‘জানতেন এই ঘটবে! কী জানতেন সব কথা বলুন।’

উত্তেজনার ঝোঁকে কথাটা বলে ফেলেই বিজয় থমকে গেল। আর কিছু বলতে চায় না, এ-কথা সে-কথা বলে আসল কথাটা চাপা দিতে চায়। ব্যোমকেশ তখন গম্ভীরভাবে বলল–’দেখুন, দেবাশিসবাবুর শত্রু তাঁকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল, দৈবক্রমে তাঁর

প্রাণ বেঁচে গেছে। আপনি যদি আসামীকে আড়াল করবার চেষ্টা করেন তাহলে সে আবার চেষ্টা করবে। আপনি কি চান, আপনার বোন বিধবা হন?'

তখন বিজয় বলল–'আমি যা জানি বলছি। কিন্তু কে আসামী, আমি জানি না।'

বিজয় দীপার প্রেম কাহিনী শোনাল। শুনে ব্যোমকেশ একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল–'মনে হয়, আপনার বোনের ছেলেমানুষী ভালবাসার নেশা কেটে গেছে। আচ্ছা, আজ আমরা উঠলাম। কাল বিকেলবেলা আমরা নৃপতিবাবুর বাড়িতে যাব। আপনিও উপস্থিত থাকবেন।'

ইতিমধ্যে পুলিসের গাড়ি ফিরে এসেছিল। ব্যোমকেশ গাড়িতে উঠে রাখালবাবুকে বলল– 'আজ এই পর্যন্ত। কাল সকালে আবার হাসপাতালে যাব।'

হাসপাতালে রাত্রি আড়াইটের সময় দেবাশিসের ঘুম ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখল, একটি মুখ তার মুখের পানে ঝুঁকে অপলক চেয়ে আছে। ভারি মিষ্টি মুখখানি। দেবাশিস আস্তে আস্তে বলল–'দীপা, কখন এলে?'

দীপা উত্তর দিতে পারল না, দেবাশিসের কপালে কপাল রেখে চুপ করে রইল।

'দীপা।'

'উঁ।'

'ক্ষিদে পেয়েছে।'

দীপা ত্বরিত মাথা তুলল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, নার্স ঘরে প্রবেশ করেছে। নার্স ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার ঘরে এসে রুগীকে দেখে গেছে। বলল–'কি খবর? ঘুম ভেঙেছে?'

দীপা বলল—'হ্যাঁ। বলছেন, ক্ষিদে পেয়েছে।'

নার্স হেসে বলল–'বেশ। আমি ওভালটিন তৈরি করে রেখেছি, এখনি আনছি। আগে একবার নাড়িটা দেখি।' নাড়ি দেখে নার্স বলল–'চমৎকার। আমি এই এলুম বলে।'

নার্সের সঙ্গে সঙ্গে দীপা দোর পর্যন্ত গেল। নকুল তখনো দোরের পাশে বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। বলল—'বউদি, দাদাবাবু খেতে চাইছে?'

দীপা বলল—'হ্যাঁ।'

'জয় জগদীশ্বর! তাহলে আর ভয় নেই। বউদি, তুমিও তো কিছু খাওনি। তোমার ক্ষিদে পায়নি?'

দীপা একটু চুপ করে থেকে বলল–’পেয়েছে। নকুল, তুমি বাড়ি যাও। নিজে খেয়ো, আর আমার জন্যে কিছু নিয়ে এস।’

‘আচ্ছা বউদি।‘

নকুল চলে গেল। নার্স ফীডিং কাপে ওভালটিন এনে দেবাশিসকে খাওয়াল। তারপর দেবাশিস তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে দীপার একটি হাত মুঠির মধ্যে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হলে দীপার মা বাবা বিজয় সকলে আবার এলেন। দেবাশিস তখন ঘুমোচ্ছে। দীপার মা দীপাকে বললেন–’দীপা, আমরা এখানে আছি, তুই বাড়ি যা, সেখানে স্নান করে একটু কিছু মুখে দিয়ে আবার আসিস।’

নেড়ে বলল—’না। নকুল আমার জন্যে খাবার এনেছিল, আমি খেয়েছি।‘

বেলা আন্দাজ দশটার সময় ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু হাসপাতালে এলেন। ডাক্তার গুপ্ত একগাল হেসে বললেন–’ভাল খবর। ছোকরা এ যাত্রা বেঁচে গেল। সকালে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তবু এখনো অন্তত দুতিন দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।’

রাখালবাবু বললেন–’ভাল। আমরা তাহলে তার সঙ্গে দেখা করতে পারি?’

ডাক্তার বললেন–’পারেন। কিন্তু দশ মিনিটের বেশি নয়।’

ব্যোমকেশ বলল–’আপাতত দশ মিনিটই যথেষ্ট।’

দেবাশিস তখন পাশ ফিরে বিছানায়, শুয়ে ছিল, আর দীপা তার মুখের কাছে ঝুকে চুপি চুপি কথা বলছিল। ব্যোমকেশ আর রাখালবাবুকে আসতে দেখে লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

ব্যোমকেশ স্মিতমুখে দীপাকে বলল—’আপনি কাল থেকে এখানে আছেন, এবার অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে যেতে হবে। আমরা ততক্ষণ দেবাশিসবাবুর কাছে আছি।’

দেবাশিস ক্ষীণকণ্ঠে বলল–’আমিও তো সেই কথাই বলছি।’

দীপা একটু ইতস্তত করল, তারপর অনিচ্ছাভরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! বলে গেল–’আমি আধা ঘণ্টার মধ্যেই আসব।’

নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন—’আমরা আপনাকে দু’চারটি প্রশ্ন করব।’

দেবাশিস বলল–’বেশ তো, করুন।’

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল। ‘আপনি কাল সন্ধ্যের পর লেকে বেড়াতে গিয়েছিলেন?’

‘ঠিক বেড়াতে যাইনি, তবে গিয়েছিলাম।’

‘কেন গিয়েছিলেন?’

‘একজন বন্ধু টেলিফোন করে ডেকেছিল।’

‘কে বন্ধু? নাম কি?’

‘খড়্গা বাহাদুর।’

‘খড়্গা বাহাদুর! নেপালী নাকি?’

‘হ্যাঁ। নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়।’

‘ও সেই! তা লেকের ধারে ডেকেছিল কেন?’

‘ব্যক্তিগত কারণ। যদি না বললে চলে–’

‘চলবে না। বলুন।’

'ওর কিছু টাকার দরকার হয়েছিল, তাই আমার কাছে ধার চাইবার জন্য ডেকেছিল।'

'আপনার বাড়িতে আসেনি কেন?'

'তা জানি না। বোধ হয় বাড়িতে আসতে সঙ্কোচ হয়েছিল, যদি কেউ জানতে পারে।'

'হুঁ। কত টাকা চেয়েছিল?'

'এক হাজার।'

'আপনি টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'না না, খড়্গা টেলিফোনে টাকার কথা বলেনি। শুধু বলেছিল জরুরী দরকার আছে।'

'তারপর?

'গিয়ে দেখলাম, সে বড় ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে; দু'জনে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। খড়্গা টাকার কথা বলল; আমি রাজী হলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর খড়্গা চলে গেল, তার অন্য একজনের সঙ্গে দেখা করবার ছিল। আমি একলা বসে রইলাম। হঠাৎ পিঠে দারুণ যন্ত্রণা হল। তারপর আর মনে নেই।'

'পিছন দিকে কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?'

'না।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল–'আপনার হৃৎপিণ্ড যে শরীরের ডান দিকে একথা আপনার স্ত্রী নিশ্চয় জানেন?'

দেবাশিস চোখ বুজে একটু চুপ করে রইল, শেষে বলল-'না, ও বোধহয় জানে না।'

'আপনার বন্ধুরা জানেন?'

'না, আমার বন্ধু বড় কেউ নেই, সহকর্মী আছে। সম্প্রতি মাস দুয়েক থেকে আমি নৃপতিদার বাড়িতে যাই, সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।'

'নৃপতিবাবুর বাড়ির বন্ধুরা কেউ জানে?'

'না।'

'কেউ জানে না?'

'বাবা জানতেন আর ডাক্তারবাবুরা জানেন।'

‘এমন কেউ আছে আপনার মৃত্যুতে যার লাভ হবে?’

‘কেউ না।’

‘আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বেশি প্রশ্ন করব না। আপনি সেরে উঠন, তারপর যদি দরকার হয় তখন দেখা যাবে।’

সন্ধ্যের পর নৃপতির ঘরে আড্ডাধারীরা সকলেই উপস্থিত হয়েছিল। বিজয়ও ছিল। সকলের মুখেই উদ্বেগের গাম্ভীর্য। আজ প্রবাল পিয়ানো বাজাচ্ছে না, তক্তপোশের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বিজয়ের মুখে দেবাশিসের কথা শোনার পর সকলেই মুহ্যমান। খবরের কাগজের দুঃসংবাদ হঠাৎ নিজের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রবাল মুখ তুলে প্রশ্ন করল–’ব্যোমকেশ বক্সী কে?’

কপিল মুখের একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম ভঙ্গী করল। বিজয় উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু উত্তর দেবার দরকার হল না, সদর দরজার বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। পরীক্ষণেই ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু প্রবেশ করলেন।

সকলে উঠে দাঁড়াল। নৃপতি এগিয়ে গিয়ে বলল–'আসুন, আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। আমার নাম নৃপতি লাহা। এঁরা— নৃপতি একে একে কপিল, প্রবাল, সুজন ও খড়্গা বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর চেয়ারে বসিয়ে সিগারেট দিল—'বিজয়ের মুখে আমরা সবই শুনেছি।'

ব্যোমকেশ একটু ভর্ৎসনার চোখে বিজয়ের পানে চাইল, বিজয় কুণ্ঠিতভাবে বলল—'হ্যাঁ ব্যোমকেশবাবু, এরা ছাড়ল না, শজারুর কাঁটার কথা এদের বলেছি।'

খড়্গা বাহাদুর বলল—'আচ্ছা ব্যোমকেশবাবু, এই যে শজারুর কাঁটা নিয়ে ব্যাপার, এটা কী? আপনার কি মনে হয়। এসব একটা পাগলের কাজ?'

ব্যোমকেশ বলল–'পাগলের কাজ হতে পারে, আবার পাগল সাজার চেষ্টাও হতে পারে।'

সুজন বলল–'সেটা কি রকম?'

ব্যোমকেশ বলল—'পাগল সাজলে অনেক সময় খুনের দায়ে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বড় জোর পাগলা গারদে বন্ধ করে রাখে, ফাঁসি হয় না, এই আর কি। আপনারা দেবাশিসবাবুর বন্ধু, তাঁর জীবন সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক কিছু জানেন।'

নৃপতি বলল–'দেবাশিসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি দিনের নয়। আমাদের মধ্যে কেবল প্রবাল তাকে আগে থেকে চিনত।' বলে প্রবালের দিকে আঙুল দেখাল।

ব্যোমকেশ প্রবালের দিকে চাইল। প্রবাল গলা পরিষ্কার করে বলল–'স্কুলে দেবাশিসের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছিলাম। তার সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল না।'

'বন্ধুত্ব ছিল না!'

'বন্ধুত্ব ছিল না, অসদ্ভাবও ছিল না। তারপর ও পাস করে দিল্লী চলে গেল, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মাস দু-এক আগে এই ঘরে তাকে আবার দেখলাম।'

'ও'—ব্যোমকেশ সিগারেটে দু'তিনটে টান দিয়ে খড়্গা বাহাদুরের দিকে চোখ ফেরাল। বলল—'কাল রাত্রে আন্দাজ আটটার সময় আপনি দেবাশিসবাবুকে টেলিফোন করেছিলেন?'

খড়্গা বাহাদুর বোধহয় প্রশ্নটা প্রতীক্ষ করছিল, সংযত স্বরে বলল—'হ্যাঁ।'

'কোথা থেকে টেলিফোন করেছিলেন?'

'এখান থেকে। নৃপতিদার টেলিফোন আছে। আমার সকলেই দরকার হলে ব্যবহার করি। কাল আমরা সকলেই এখানে ছিলাম, দেবাশিস ছাড়া। তার আশায় অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সে যখন এল না। তখন তাকে টেলিফোন করেছিলাম।'

'তারপর লেকে দেখা হয়েছিল। এখন একটা কথা বলুন দেখি, আপনি যখন দেবাশিসবাবুকে ছেড়ে চলে আসেন তখন আশেপাশে কাউকে দেখেছিলেন?'

'দেখে থাকলেও লক্ষ্য করিনি। আমরা একটা গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসেছিলাম। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, লোকজন বেশি ছিল না।'

ব্যোমকেশ তখন নৃপতিকে বলল–'আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। আমরা আপনাদের পৃথকভাবে প্রশ্ন করতে চাই। আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসব, আর আপনারা একে একে আসবেন। ছোট একটা ঘর পাওয়া যাবে কি?'

নৃপতি বলল–'পাশেই ছোট ঘর আছে, আসুন দেখাচ্ছি।'

পরদা-ঢাকা দরজা দিয়ে নৃপতি তাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি ছোট, কয়েকটি চেয়ারের মাঝখানে একটি গোল টেবিল, টেবিলের ওপর টেলিফোন যন্ত্র।

ব্যোমকেশ বলল–'এই তো ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। রাখাল, তুমি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত কর। নৃপতিবাবু, আপনি বাকি সকলকে বসতে বলে আসুন। আগে আপনার জেরা শেষ করে একে একে ওঁদের ডাকব।'

ছোট্ট ঘরটিতে এজলাস বসল। প্রশ্নোত্তর চলল। চাকর কফি দিয়ে গেল। একে একে সকলে সাক্ষী দিল। সকলের শেষে ঐল বিজয়। ব্যোমকেশ তাকে বলল, 'বিজয়বাবু,

আপনার বোনের আইবুড়ো বেলার বই-খাতা জিনিসপত্র নিশ্চয় এখনো আপনাদের বাড়িতে আছে? বেশ। কাল আমরা যাব, একটু নেড়েচেড়ে দেখব। যদি দরকারী কিছু পাওয়া যায়।'

বিজয় বলল, 'আচ্ছা।'

অতঃপর সভা ভঙ্গ হল। দশটা বাজতে তখন বেশি দেরি নেই।

০৯. বিজয় নিজেদের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল

পরদিন সকাল আটটার সময় বিজয় নিজেদের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল, ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু আসতেই তাঁদের দোতলায় দীপার ঘরে নিয়ে গেল। বলল–'এইটে দীপার ঘর। এই ঘরেই তার যা কিছু আছে, বিশেষ কিছু নিয়ে যায়নি।'

বেশ বড় ঘর। জানলার পাশে খাট বিছানা, অন্য পাশে টেবিল চেয়ার বই-এর আলমারি। পিছনের দেয়ালে একটি এস্রাজ ঝুলছে। টেবিলের মাঝখানে ছোট্ট একটি জাপানী ট্রানজিস্টার রাখা আছে। ব্যোমকেশ ঘরের চারদিকে একবার সন্ধানী চোখ ফিরিয়ে বলল–'দীপা দেবীর দেখছি গানবাজনার শখ আছে।'

বিজয় বলল—'হ্যাঁ, একটু-আধটু এস্রাজ বাজাতেও জানে। নিজের চেষ্টাতে শিখেছে।'

'লেখাপড়া কত দূর শিখেছেন?'

'স্কুলের পড়া শেষ পর্যন্ত পড়েছে। কলেজে দেওয়া হয়নি।'

'আপনার বাবা বাড়িতে আছেন?'

'না। বাবা মা হাসপাতালে গেছেন।'

'দেবাশিসবাবু ভাল আছেন। আমি টেলিফোনে খবর নিয়েছিলাম। বোধহয় দু-তিন দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

'হ্যাঁ। আপনারা চা খাবেন?'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল–'আপত্তি কি? একবার হয়েছে, কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়।'

'আচ্ছা, আমি চা নিয়ে আসছি, আপনারা দেখুন। বই-এর আলমারির চাবি খুলে দিয়েছি। খাটের তলায় দুটো ট্রাঙ্ক আছে, তার চাবিও খোলা।'

বিজয় বেরিয়ে যাবার পর ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে বলল–'ঘরে তল্লাশ করার মত বিশেষ কিছু নেই দেখছি। আমি বই-এর আলমারিটা দেখি, তুমি ততক্ষণ ট্রাঙ্ক দুটো হাঁটকাও।'

রাখালবাবু খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্ক দুটো টেনে বার করলেন, ব্যোমকেশ আলমারি খুলে বই দেখতে লাগিল। বইগুলি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো; প্রথম সারিতে কবিতা আর গানের বই; সঞ্চয়িতা গীতবিতান দ্বিজেন্দ্রগীতি নজরুলগীতিকা প্রভৃতি। দ্বিতীয় থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কয়েক ভলুম গ্রন্থাবলী। নীচের থাকে স্কুল-পাঠ্য বই। দীপা স্কুলে পড়ার সময় যে বইগুলি পড়েছিল সেগুলি যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে।

ব্যোমকেশ বইগুলি একে একে খুলে দেখল, কিন্তু কোথাও এমন কিছু পেল না। যা থেকে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আধুনিক কোনো লেখকের বই আলমারিতে নেই, এমন কি শরৎচন্দ্রের বইও না; এ থেকে পারিবারিক গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া যায়, দীপার মানসিক প্রবণতার কোনো ইশারা তাতে নেই।

‘ব্যোমকেশদা, একবার এদিকে আসুন।’

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি একটা খোলা ট্রাঙ্কের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, সামনে মেয়েলী জামাকাপড়ের স্তূপ, হাতে পোস্টকার্ড আয়তনের একটি সুদৃশ্য বাঁধানো খাতা। খাতাটি ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে রাখালবাবু বললেন- ‘কাপড়-চোপড়ের তলায় ছিল। পড়ে দেখুন।’

অটোগ্রাফের খাতা। বেশির ভাগ পাতাই খালি, সামনের কয়েকটি পাতায় উদয়মাধব প্রভৃতি বাড়ির কয়েকজনের হস্তাক্ষর, দু-একটি মেয়েলী কাঁচা হাতের নাম দস্তখত। তারপর একটি পাতায় একজনের স্বাক্ষরের ওপর একটি কবিতার ভগ্নাংশ-তোমার চোখের বিজলী-উজল আলোকে, পরাণে আমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে।–তারপর আর সব পৃষ্ঠা শূন্য।

অটোগ্রাফের খাতাটি যে দীপার তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, মলাটের ওপরেই তার নাম লেখা রয়েছে।

যিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটু মোচড় দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর নামটি অপরিচিত নয় , তিনি বিশেষ একটি আড্ডার নিয়মিত সভ্য।

ব্যোমকেশ খাটো গলায় বলল–'হুঁ! আমাদের সন্দেহ তাহলে মিথ্যে নয়।'

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চট্ট করে অটোগ্রাফের খাতাটি পকেটে পুরে রাখালবাবুকে চোখের ইশারা করল।

বিজয় দুহাতে দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল, বলল—'আসুন। কিছু পেলেন?'

রাখালবাবু কেবল গলার মধ্যে শব্দ করলেন, ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল—'সত্যান্বেষণের পথ বড় দুর্গম। কোথায় কোন কানা গলির মধ্যে সত্য লুকিয়ে আছে, কে বলতে পারে! যাহোক, নিরাশ হবেন না, দু-চার দিনের মধ্যেই আসামী ধরা পড়বে।'

তারপর দু'জনে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় যেতে যেতে রাখালবাবু বললেন–তাহলে এখন বাকি রইল শুধু আসামীকে গ্রেপ্তার করা। অবশ্য পাকা রকম সাক্ষীসাবুদ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে পাকড়ানো যাবে না।'

ব্যোমকেশ বলল-না, তাকে পাকড়াবার একটা ফন্দি বার করতে হবে। কিন্তু তার আগে নিঃসংশয়ভাবে জানা দরকার, দেবাশিসের স্ত্রী এ ব্যাপারে কতখানি লিপ্ত আছে।'

হাসপাতালে ডাক্তার গুপ্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। একটি নিভৃত ঘরে দীপার সঙ্গে ব্যোমকেশ ও রাখালবাবুর কথা হল। ব্যোমকেশ বলল–'আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। কেন প্রশ্ন করতে চাই এখন জানতে চাইবেন না, পরে আপনিই জানতে পারবেন।'

দীপা সহজভাবে বলল—'কি জানতে চান, বলুন।' তার মুখে আতঙ্কের ভাব আর নেই, সে তার স্বাভাবিক সাহস অনেকটা ফিরে পেয়েছে।

সওয়াল জবাব আরম্ভ হল। রাখালবাবু অচঞ্চল চোখে দীপার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

ব্যোমকেশ বলল–'নৃপতি লাহা নামে একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে যাঁদের নিয়মিত আড্ডা বসে তাঁদের আপনি চেনেন?

দীপার চোখের দৃষ্টি সতর্ক হল, সে বলল—'হ্যা, চিনি। ওঁরা সবাই আমার দাদার বন্ধু।'

'ওঁরা আপনার বাপের বাড়িতে যাতায়াত করেন?'

'বাড়িতে কাজকর্ম থাকলে আসেন।'

‘এঁদের নাম নৃপতি লাহা, সুজন মিত্র, কপিল বসু প্রবাল গুপ্ত, খড়্গা বাহাদুর। এঁদের ছাড়া আর কাউকে চেনেন?’

‘না, কেবল এদেরই চিনি।’

‘আচ্ছা, নৃপতি লোহা বিপত্নীক আপনি জানেন?’

‘...যেন শুনেছিলাম।’

‘এঁদের মধ্যে আর কারুর বিয়ে হয়েছে কিনা জানেন?’

‘বোধহয়...আর কারুর বিয়ে হয়নি।’

‘প্রবাল গুপ্ত কি বিবাহিত?’

‘ঠিক জানি না...বোধ হয় বিবাহিত নয়।’

‘প্রবাল গুপ্ত বিবাহিত...সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে।’

‘...আমি জানতাম না।’

'যাক। কপিল বসু লোকটিকে আপনার কেমন লাগে?

'ভালই তো।'

'ওর সম্বন্ধে কোনো কুৎসা শুনেছেন?'

'না।'

'আর সুজন মিত্র? সে সিনেমার আর্টিস্ট, তার সম্বন্ধে কিছু শোনেননি?'

'না, ও-সব আমি কিছু শুনিনি।'

'আপনি সিনেমা দেখতে ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ।'

'সুজন মিত্রের অভিনয় কেমন লাগে?

'খুব ভাল।'

'উনি কেমন লোক?'

'দাদার বন্ধু, ভালই হবেন। দাদা মন্দ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন না।'

'তা বটে। আপনি ফুটবল খেলা দেখেছেন?'

'ছেলেবেলায় দেখেছি, যখন স্কুলে পড়তুম।'

'খড়্গা বাহাদুরের খেলা দেখেছেন?'

'না... রেডিওতে খেলার কমেন্টারি শুনেছি।'

'এবার শেষ প্রশ্ন। —আপনার স্বামীর হৃদযন্ত্র বুকের ডান দিকে আপনি জানেন?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলে চাইল-'জানেন?'

'হ্যাঁ, কিছুদিন আগে দুপুর রাত্রে আমার স্বামীর কম্প দিয়ে জ্বর এসেছিল। আমাকে ডাক্তার ডাকতে বললেন। আমি জানতুম না ওঁদের পারিবারিক ডাক্তার কে, তাই আমার বাপের বাড়ির ডাক্তারকে ফোন করলাম। সেনকাকা এসে ওঁকে পরীক্ষা করলেন, তারপর যাবার সময় আমাকে আড়ালে বলে গেলেন যে, ওঁর হৃদযন্ত্র উল্টে দিকে। এরকম নাকি খুব বেশি দেখা যায় না।'

প্রকাণ্ড হাফ-ছাড়া নিশ্বাস ফেলে ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল, বলল—’আমার বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। আর কিছু জানবার নেই, আপনি স্বামীর কাছে যান। — চলো রাখাল।’

হাসপাতালের বাইরে এসে ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে প্রশ্ন করল—’কি দেখলে? কি বুঝলে?’ রাখালবাবু বললেন–কোনো ভুল নেই, মেয়েটি নির্দোষ। প্রতিক্রিয়া যখন যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনটি পাওয়া গেছে। এখন কিং কর্তব্য?’

ব্যোমকেশ বলল—‘এখন তুমি থানায় যাও, আমি বাড়ি যাই। ভাল কথা, একটা বুলেট-প্রুফ গেঞ্জি যোগাড় করতে পার?’

‘পারি। কী হবে?’

‘একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। আজ রাত্রে গেঞ্জি নিয়ে আমার বাড়িতে এস, তখন বলব?’

সন্ধ্যের পর ব্যোমকেশ একা নৃপতির আড্ডায় গেল। সকলেই উপস্থিত ছিল, ব্যোমকেশকে ছেঁকে ধরল। নৃপতি তার সামনে সিগারেটের কৌটো খুলে ধরে বলল—

'খবর নিয়েছি। দু-এক দিনের মধ্যেই দেবাশিসকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। ওর বিপন্মুক্তি উপলক্ষে আমি পার্টি দেব, আপনাকে আসতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল–'নিশ্চয় আসব।'

কপিল ব্যোমকেশের গা ঘেঁষে বসে আবদারের সুরে বলল–'আপনার সত্যান্বেষণ কত দূর অগ্রসর হল, বলুন না ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'দিল্লী দূরস্ত। শজারুর কাঁটার ওস্তাদটি কে তা এখনো জানা যায়নি। তবে একটা থিওরি খাড়া করেছি।'

সুজন গলা বাড়িয়ে বলল—'কি রকম থিওরি?'

ব্যোমকেশ সিগারেটে কয়েকটা ধীর মন্থর টান দিয়ে বলতে আরম্ভ করল—'ব্যাপারটা হচ্ছে এই। কোনো একজন অজ্ঞাত লোক শজারুর কাঁটা দিয়ে প্রথমে একটা ভিখিরিকে খুন করল, তারপর এক মজুরকে খুন করল, তারপর আবার খুন করল এক দোকানদারকে। এবং সর্বশেষে দেবাশিসবাবুকে খুন করবার চেষ্টা করল। চার বারই অস্ত্র হচ্ছে শজারুর কাঁটা। অর্থাৎ হত্যাকারী জানাতে চায় যে চারটি হত্যাকার্য একই লোকের কাজ।

‘এখন হত্যাকারী যদি পাগল হয় তাহলে কিছুই করবার নেই। পাগল অনেক রকম হয়; এক ধরনের পাগল আছে যাদের পাগল বলে চেনা যায় না; তারা অত্যন্ত ধূর্ত, তাদের খুন করার কোনো যুক্তিসঙ্গত মোটিভ থাকে না। এই ধরনের পাগলকে ধরা বড় কঠিন।

‘কিন্তু যদি পাগল না হয়? যদি পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে কেউ পাগল সেজে শজারুর কাঁটার ফন্দি বার করে থাকে? মনে করুন, দেবাশিসবাবুর এমন কোনো গুপ্ত শত্রু আছে। যে তাঁকে খুন করতে চায়। সরাসরি খুন করলে ধরা পড়ার ভয় বেশি, তাই সে ভিখিরি খুন করে কাজ আরম্ভ করল; তারপর মজুর, তারপর দোকানদার, তারপর দেবাশিসবাবু। স্বভাবতাই মনে হবে দেবাশিসবাবু হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য নয়, একটা বিকৃতমস্তিষ্ক লোক যখন যাকে সুবিধে পাচ্ছে খুন করে যাচ্ছে। হত্যাকারী যে দেবাশিসবাবুকেই খুন করবার জন্যে এত ভণিতা করেছে। তা কেউ বুঝতে পারবে না। —এই আমার থিওরি।’

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর নৃপতি বলল—’কিন্তু মনে করুন। এর পর আবার একটা খুন হল শজারুর কাঁটা দিয়ে! তখন তো বলা চলবে না যে দেবাশিসই হত্যাকারীর আসল লক্ষ্য।’

ব্যোমকেশ বলল–’না। তখন আবার নতুন রাস্তা ধরতে হবে।’

কপিল বলল–’খুনীকে কি ধরা যাবে?

ব্যোমকেশ বলল–'চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

এমন সময় কফি এল। প্রবাল উঠে গিয়ে পিয়ানোতে মৃদু টুং-টাং আরম্ভ করল। ব্যোমকেশ কফি শেষ করে আরো কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে বাড়ি ফিরে চলল।

ব্যোমকেশ বাড়ি ফিরে আসার কয়েক মিনিট পরে পৌনে ন'টার সময় রাখালবাবু এলেন। তাঁর হাতে একটি মোড়ক। ব্যোমকেশ বলল–'এনেছ?'

রাখালবাবু মোড়ক খুলে দেখালেন; ব্রোকেডের মত কাপড় দিয়ে তৈরি একটি ফতুয়া, কিন্তু সোনালী বা রূপালী জরির ব্রোকোড নয়, স্টীলের জরি দিয়ে তৈরি। ঘন-পিনদ্ধ লৌহ-জালিক। জামার ভিতরে পরলে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু এই কঠিন বর্ম ভেদ করা ছোরাছুরি তো দূরের কথা, পিস্তল রিভলবারেরও অসাধ্য।

ব্যোমকেশ জামাটি নিয়ে নেড়েচেড়ে পাশে রাখল, বলল—'আমার গায়ে ঠিক হবে। এখন আর একটা কথা বলি; আমাদের শজারুর পিছনে লেজুড় লাগাবার ব্যবস্থা করেছ?'

রাখালবাবু বললেন–সব ব্যবস্থা হয়েছে। আজ রাত্রি সাতটা থেকে লেজুড় লেগেছে, এক লহমার জন্যে তাকে চোখের আড়াল করা হবে না। দিনের বেলাও তার পিছনে লেজুড় থাকবে।'

ব্যোমকেশ বলল–'বেশ। এখন এস পরামর্শ করি। আমি পুকুরে চার ফেলে এসেছি–'

খাটো গলায় দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ হল। তারপর সাড়ে ন'টা বাজলে রাখালবাবু ওঠবার উপক্রম করছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ব্যোমকেশ ফোন তুলে নিয়ে বলল—'হ্যালো।'

অপর প্রান্ত থেকে চেনা গলা শোনা গেল–'ব্যোমকেশবাবু? আপনি একলা আছেন?'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর দিকে সঙ্কেত-ভরা দৃষ্টিপাত করে বলল—'হ্যা, একলা আছি। আপনি–'

'গলা শুনে চিনতে পারছেন না?'

'না। আপনার নাম?'

'যখন গলা চিনতে পারেননি। তখন নাম না জানলেও চলবে। আজ সন্ধ্যের পর আপনি যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে আমি ছিলাম। একটা গোপন খবর আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সকলের সামনে বলতে পারলাম না।'

'গোপন খবর! শজারুর কাঁটা সম্বন্ধে?'

'হ্যাঁ। আপনি যদি আজ রবীন্দ্র সরোবরের বড় ফটকের কাছে আসেন আপনাকে বলতে পারি।'

'বেশ তো, বেশ তো। কখন আসব বলুন।'

'যত শীগগির সম্ভব। আমি অপেক্ষা করব। একলা আসবেন কিন্তু। অন্য কারুর সামনে আমি কিছু বলব না।'

'বেশ। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরুচ্ছি।'

টেলিফোন রেখে ব্যোমকেশ যখন রাখালবাবুর দিকে তাকাল তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে খুলতে সে বলল, 'টোপ ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মাছ টোপ গিলেছে। এত শীগগির ওষুধ ধরবে ভাবিনি। রাখাল, তুমি—'

ব্যোমকেশ পাঞ্জাবি খুলে ফেলল, রাখালবাবু তাকে বুলেট-প্রুফ ফতুয়া পরাতে পরাতে বললেন—'আমার জন্যে ভাববেন না, আমি ঠিক যথাস্থানে থাকব। শজারুর পিছনে লেজুড় আছে, তিনজনে মিলে শজারুকে কাবু করা শক্ত হবে না।'

'বেশ।'

ব্যোমকেশ ফতুয়ার ওপর আবার পাঞ্জাবি পরিল, তারপর রাখালবাবুর দিকে একবার অর্থপূর্ণ ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল। রাখালবাবু কব্জিতে ঘড়ি দেখলেন, দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট। তিনিও বেরিয়ে পড়লেন। প্রচ্ছন্নভাবে যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে হবে।

রবীন্দ্র সরোবরের সদর ফটকের সামনে লোক চলাচল নেই; কদাচিৎ একটা বাস কিংবা মোটর হুস করে সাদার্ন অ্যাভেনু দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ব্যোমকেশ দ্রুতপদে সাদার্ন অ্যাভেনু রাস্তা পেরিয়ে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল; এদিক-ওদিক তাকাল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। রবীন্দ্র সরোবরের ভিতরে আলো-আঁধারিতে জনমানব চোখে পড়ে না।

ব্যোমকেশ ফটকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করল, তারপর ভিতর দিকে অগ্রসর হল। দু-চার পা এগিয়েছে, একটি লোক অদূরের গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল, হাত তুলে ব্যোমকেশকে ইশারা করে ডাকল। ব্যোমকেশ তার কাছে গেল, লোকটি বলল, চলুন, ওই বেঞ্চিতে বসা যাক।।'

জলের ধারে গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা। ব্যোমকেশ গিয়ে বেঞ্চিতে ডানদিকের কিনারায় বসল। চারিদিকের ঝিকিমিকি আলোতে অস্পষ্টভাবে মুখ দেখা যায়, তার বেশি নয়। ব্যোমকেশ বলল—'এবার বলুন, আপনি কি জানেন।'

লোকটি বলল–’বলছি। দেখুন, যার কথা বলতে চাই সে আমার ঘনিষ্ঠ লোক, তাই বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। সিগারেট আছে?’

ব্যোমকেশ সিগারেটের প্যাকেট বার করে দিল; লোকটি সিগারেট নিয়ে প্যাকেট ব্যোমকেশকে ফেরত দিল, নিজের পকেট থেকে বোধকরি দেশলাই বার করতে করতে হঠাৎ বলে উঠল—’দেখুন, দেখুন কে আসছে।’ তার দৃষ্টি ব্যোমকেশকে পেরিয়ে পাশের দিকে প্রসারিত, যেন ব্যোমকেশের দিক থেকে কেউ আসছে।

ব্যোমকেশ সেই দিকে ঘুরে বসল। সে প্রস্তুত ছিল, অনুভব করল তার পিঠের বাঁ দিকে বুলেট-প্রুফ আবরণের ওপর চাপ পড়ছে। ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে পিছু ফিরল। লোকটি তার পিঠে শজারুর কাঁটা বিঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল, পলকের জন্যে হতবুদ্ধির মত চাইল, তারপর দ্রুত উঠে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যোমকেশের বজ্রমুষ্টি লোহার মুগুরের মত তার চোয়ালে লেগে তাকে ধরাশায়ী করল।

ইতিমধ্যে আরো দু’টি মানুষ আলাদিনের জিনের মত আবির্ভূত হয়েছিল, তারা ধরাশায়ী লোকটির দু’হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল। রাখালবাবু তার হাত থেকে শজারুর কাঁটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন–’প্রবাল গুপ্ত, তুমি তিনজনকে খুন করেছ এবং দু’জনকে খুন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছ। চল, এবার থানায় যেতে হবে।’

১০.মেঘাচ্ছন্ন সকালবেলা

হাপ্ত দুই পরে একদিন মেঘাচ্ছন্ন সকালবেলা ব্যোমকেশের বসবার ঘরে পারিবারিক চায়ের আসর বসেছিল। অজিত ছিল, সত্যবতীও ছিল। গত রাত্রি থেকে বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে, মাঝে মাঝে থামছে, আবার আরম্ভ হচ্ছে। গ্রীষ্মের রক্তিম ক্রোধ মেহে বিগলিত হয়ে গেছে।

অজিত বলল–'এমন একটা গাইয়ে লোককে তুমি পুলিসে ধরিয়ে দিলে! লোকটা বড় ভাল গায়।–সত্যিই এতগুলো খুন করেছে?'

সত্যবতী বলল—'লোকটা নিশ্চয় পাগল।'

ব্যোমকেশ বলল—'প্রবাল গুপ্ত পাগল নয়; কিন্তু একেবারে প্রকৃতিস্থ মানুষও নয়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল, হঠাৎ দৈব-দুর্বিপাকে গরীব হয়ে গেল; দারিদ্র্যের তিক্ত রসে ওর মনটা বিষিয়ে উঠল। ওর চরিত্রে ষড়রিপুর মধ্যে দুটো বলবান-লোভ আর ঈর্ষা। দারিদ্র্যের আবহাওয়ায় এই দুটো রিপু তাকে প্রকৃতিস্থ থাকতে দেয়নি।'

সত্যবতী বলল–'সব কথা পরিষ্কার করে বল। তুমি বুঝলে কি করে যে প্রবাল গুপ্তই আসামী?'

ব্যোমকেশ পেয়ালায় দ্বিতীয়বার চা ঢেলে সিগারেট ধরাল। আস্তে-আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে অলস কণ্ঠে বলতে শুরু করল—

'এই রহস্যর চাবি হচ্ছে শজারুর কাঁটা। আততায়ী যদি পাগল হয় তাহলে আমরা অসহায়, বুদ্ধির দ্বারা তাকে ধরা যাবে না। কিন্তু যদি পাগল না হয় তখন ভেবে দেখতে হবে, সে ছোরা-ছুরি ছেড়ে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করে কেন? নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। কী সেই উদ্দেশ্য?

দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকবার আততায়ী শজারুর কাঁটা মৃতদেহে বিঁধে রেখে দিয়ে যায়, অর্থাৎ সে জানাতে চায় যে, এই খুনগুলো একই লোকের কাজ। যে ভিখিরিকে খুন করেছে, সেই মজুরকে খুন করেছে এবং দোকানদারকেও খুন করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন?

আমার কাছে এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর-ভিখিরি থেকে দোকানদার পর্যন্ত কেউ হত্যাকারীর আসল লক্ষ্য নয়, আসল লক্ষ্য অন্য লোক। কেবল পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে হত্যাকারী এলোপাথাড়ি তিনটে খুন করেছে, যাতে পুলিস কোনো মোটিভ খুঁজে না পায়।

তারপর চেষ্টা হল শজারুর কাঁটা দিয়ে দেবাশিসকে খুন করবার। দেবাশিস দৈব কৃপায় বেঁচে গেল, কিন্তু আততায়ী কে তা জানা গেল না।

আমার সত্যান্বেষণ আরম্ভ হল এইখান থেকে। দেবাশিসই যে হত্যাকারীর চরম লক্ষ্য তা এখনো নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু মনে হয় তার ওপরে আর কেউ নেই। ভিখিরি থেকে শিল্পপতি, তার চেয়ে উঁচুতে আর কেউ না থাকাই সম্ভব। যাহোক, তদারক করে দেখা যেতে পারে।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল, নৃপতির আড্ডায় যারা যাতায়াত করে তারা ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দেবাশিসের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই; ফ্যাক্টরির লোকেরা তাকে ভালবাসে, ফ্যাক্টরিতে আজ পর্যন্ত একবারও স্ট্রাইক হয়নি। আর একটা তথ্য জানা গেল, বিয়ের আগে দীপা একজনের প্রেমে পড়েছিল, তার সঙ্গে পালাতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তারপরে দেবাশিসের সঙ্গে দীপার বিয়ে হয়।

দীপার গুপ্ত প্রণয়ী কে ছিল দীপা ছাড়া কেউ তা জানে না। কে হতে পারে? দীপার বাপের বাড়িতে গোঁড়া সাবেকী চাল, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার দীপার নেই, কেবল দাদার বন্ধুরা যখন বাড়িতে আসে তখন তাদের সঙ্গে সামান্য মেলামেশার সুযোগ পায়। সুতরাং তার প্রেমিক সম্ভবত তার দাদারই এক বন্ধু, অর্থাৎ নৃপতি কিংবা তার আড্ডার একজন।

এই সঙ্গে একটা মোটিভও পাওয়া যাচ্ছে। দীপার ব্যর্থ প্রেমিক তার স্বামীকে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে যদি সে নৃশংস এবং বিবেকহীন হয়। যে-লোক শজারুর কাঁটা দিয়ে তিনটে খুন করেছে সে যে নৃশংস এবং বিবেকহীন তা বলাই বাহুল্য। নৃপতির আড্ডায় যারা আসত তাদের সঙ্গে দেবাশিসের আলাপ মাত্র দু'মাসের। কেবল একজনের সঙ্গে

তার স্কুল থেকে চেনাশোনা ছিল, সে প্রবাল গুপ্ত। চেনাশোনা ছিল কিন্তু সম্প্রীতি ছিল না। প্রবাল গুপ্ত যদি দীপার প্রেমাস্পদ হয়–

বাকি ক'জনকেও আমি নেড়েচেড়ে দেখেছি। নৃপতির একটি স্ত্রীলোক আছে, তার কাছে সে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে অভিসারে যায়। সুজন মিত্র ব্যর্থ প্রেমিক, সে যাকে ভালবাসে বছরখানেক আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে। খড়্গা বাহাদুর এবং কপিলের জীবনে নারী-ঘটিত কোনো জটিলতা নেই। খড়্গা বাহাদুর শুধু ফুটবলই খেলে না, জুয়াও খেলে। কপিল আদর্শবাদী ছেলে, পৃথিবীর চেয়ে আকাশেই তার মন বেশি বিচরণ করে।

কিন্তু আর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার নেই, সাঁটে বলছি। দীপার বাপের বাড়িতে তার ঘর তল্লাশ করে পাওয়া গেল একটি অটোগ্রাফের খাতা; তাতে নৃপতির আড্ডার কেবল একটি লোকের হস্তাক্ষর আছে, সে প্রবাল গুপ্ত। প্রবাল লিখেছে-তোমার চোখের বিজলি-উজল আলোকে, পরাণে আমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে। তার কথায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। আরো জানা গেল দীপা গান ভালবাসে, কিন্তু প্রবাল যে বিবাহিত তা সে জানে না। সুতরাং কে গানের ফাঁদ পেতে দীপাকে ধরেছে তা জানতে বাকি রইল না।

তারপর আর একটি কথা লক্ষ্য করতে হবে। যেদিন ভোরবেলা ভিখিরিকে শজারুর কাঁটা দিয়ে মারা হয় সেইদিন রাত্রে দীপার ফুলশয্যা। সমাপতনটা আকস্মিক নয়।

এবার প্রবালের দিক থেকে গল্পটা শোন।

যারা জন্মাবধি গরীব, দারিদ্র্যে তাদের লজ্জা নেই; কিন্তু যারা একদিন বড়মানুষ ছিল, পরে গরীব হয়ে গেছে, তাদের মনঃক্লেশ বড় দুঃসহ। প্রবালের হয়েছিল সেই অবস্থা। বাপ মারা যাবার পর সে অভাবের দারুণ দুঃখ ভোগ করেছিল, তার লোভী ঈর্ষালু প্রকৃতি দারিদ্র্যের চাপে বিকৃত হয়ে চতুর্গুণ লোভী এবং ঈর্ষালু হয়ে উঠেছিল। গান গেয়ে সে মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তার প্রাণে সুখ ছিল না। একটা রুগ্ন মরণাপন্ন মেয়েকে বিয়ে করার ফলে তার জীবন আরো দুর্বহ হয়ে উঠেছিল।

কিছুদিন আগে ওর বউ মারা গেল। বউ মরার আগে থাকতেই বোধহয় ও দীপার জন্যে ফাঁদ পেতেছিল; ও ভেবেছিল বড় ঘরের একমাত্র মেয়েকে যদি বিয়ে করতে পারে, ওর অবস্থা আপনা থেকেই শুধরে যাবে। দীপার চরিত্র যতাই দৃঢ় হোক, সে গানের মোহে প্রবালের দিকে আকৃষ্ট হল। মুখোমুখি দেখাসাক্ষাতের সুযোগ বেশি ছিল না। টেলিফোনে তাদের যোগাযোগ চলতে লাগল।

পালিয়ে গিয়ে দীপকে বিয়ে করার মতলব প্রবালের গোড়া থেকেই ছিল; দীপা যে ঠাকুরদার অনুমতি চাইতে গিয়েছিল সেটা নিতান্তাই লোক-দেখানো ব্যাপার। প্রবাল জানত বুড়ো রাজী হবে না। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে একবার বিয়েটা হয়ে গেলে আর ভয় নেই, দীপাকে তার বাপ-ঠাকুরদা ফেলতে পারবে না।

দীপা বাড়ি থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি দেবাশিসের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হল।

প্রবালের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখ। অন্য কারুর সঙ্গে দীপার বিয়ে হলে সে বোধহয় এমন ক্ষেপে উঠত না। কিন্তু দেবাশিস! হিংসেয় রাগে তার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল।

বিয়ের সম্বন্ধ যখন স্থির হয়ে গেল তখন সে ঠিক করল দেবাশিসকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করবে। দীপা তখন স্বাধীন হবে, বাপের বাড়িয় শাসন আর থাকবে না। দীপাকে বিয়ে করলে দেবাশিসের সম্পত্তি তার হাতে থাকবে। একসঙ্গে রাজকন্যে এবং রাজত্ব। দেবাশিসের আর কেউ নেই প্রবাল তা জানত।

কিন্তু প্রথমেই দেবাশিসকে খুন করা চলবে না। তাহলে সে যখন দীপাকে বিয়ে করবে তখন সকলের সন্দেহ তার ওপর পড়বে। ক্রূর এবং নৃশংস প্রকৃতির প্রবাল এমন এক ফন্দি বার করল যে, কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। শজারুর কাঁটার নাটকীয় খেলা আরম্ভ হল। তিনটি মানুষ বেঘোরে প্রাণ দিল।

যাহোক, প্রবাল দেবাশিসকে মারবার সুযোগ খুঁজছে। আমার বিশ্বাস সে সর্বদাই একটা শজারুর কাঁটা পকেটে নিয়ে বেড়াত; কখন সুযোগ এসে যায় বলা যায় না। একদিন হঠাৎ সুযোগ এসে গেল।

নৃপতির আড্ডাঘরের পাশের ঘরে টেলিফোন আছে। দোরের পাশে পিয়ানো, প্রবাল সেখানে বসে ছিল; শুনতে পেল খড়্গা বাহাদুর দেবাশিসকে টেলিফোন করছে, জানতে

পারল ওরা রবীন্দ্র সরোবরের এক জায়গায় দেখা করবে। প্রবাল দেখল এই সুযোগ। শজারুর কাঁটা তার পকেটেই ছিল, সে যথাস্থানে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। তারপর–

প্রবাল জানত না যে প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় খামখেয়ালির ফলে দেবাশিসের হৃৎপিণ্ডটা বুকের ডান পাশে আছে। দীপা অবশ্য জানত। কিন্তু প্রবাল যে দেবাশিসকে খুন করে তাকে হস্তগত করার মতলব করেছে তা সে বুঝতে পারেনি। হাজার হোক মেয়েমানুষের বুদ্ধি; বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কখনো অর্ধেক বৈ পুরা দেখিলাম না।'

এই হল গল্প। আর কিছু জানবার আছে?'

অজিত প্রশ্ন করল–'তোমাকে মারতে গিয়েছিল কেন?'

ব্যোমকেশ বলল–'আমি সেদিন ওদের আড্ডায় গিয়ে বলে এসেছিলাম যে শজারুর কাঁটা দিয়ে যদি আর খুন না হয়, তাহলে বুঝতে হবে দেবাশিসই আততায়ীর প্রধান লক্ষ্য। তাই প্রবাল ঠিক করল আমাকে খুন করেই প্রমাণ করবে যে, দেবাশিস আততায়ীর প্রধান লক্ষ্য নয়; সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। আমি যে তাকে ধরবার জন্যেই ফাঁদ পেতেছিলাম তা সে বুঝতে পারেনি।'

সত্যবতী গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল–'বাব্বা! কী রাক্কুসে মানুষ! দীপার কিন্তু কোনো দোষ নেই। একটা সহজ স্বাভাবিক মেয়েকে খাঁচার পাখির মত বন্ধ করে রাখলে সে উড়ে পালাবার চেষ্টা করবে না?'

খুটি খুঁট করে সদর দরজায় টোকা পড়ল। ব্যোমকেশ উঠে গিয়ে দোর খুলল–'আরে দেবাশিসবাবু যে! আসুন আসুন।'

দেবাশিস সঙ্কুচিতভাবে ঘরে প্রবেশ করল। সত্যবতী উঠে দাঁড়িয়েছিল, দেবাশিসের নাম শুনে পরম আগ্রহে তার পানে চাইল। দেবাশিসের চেহারা আবার আগের মত হয়েছে, দেখলে মনে হয় না সে সম্প্রতি যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। সে হাত জোড় করে বলল–'আজ রাত্রে আমার বাড়িতে সামান্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছি, আপনাদের সকলকে যেতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলল—'বেশ, বেশ। বসুন। তা উপলক্ষটা কী?

দেবাশিস রুদ্ধ কণ্ঠে বলল–'ব্যোমকেশদা, আজ আমাদের সত্যিকার ফুলশয্যা। দীপাকে আমার সঙ্গে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে লজ্জায় আধমরা হয়ে আছে, এল না। বউদি, আপনি নিশ্চয় আসবেন, নইলে দীপার লজ্জা ভাঙবে না।'